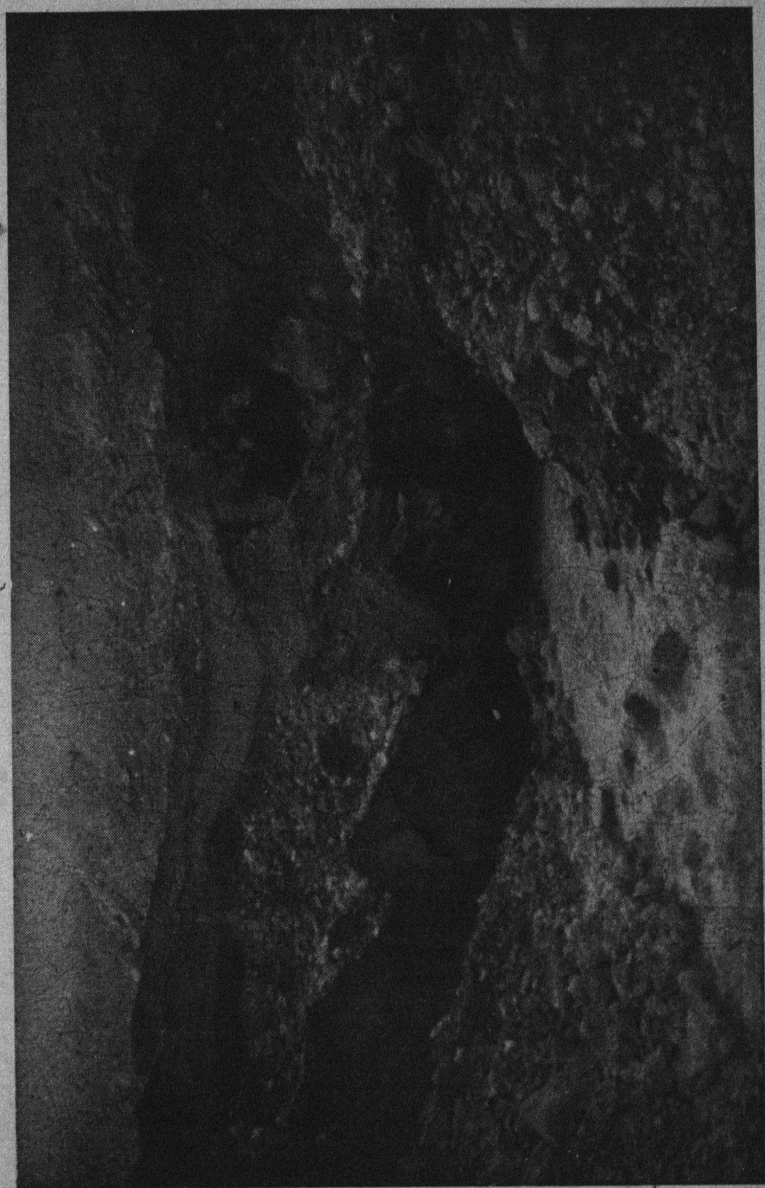
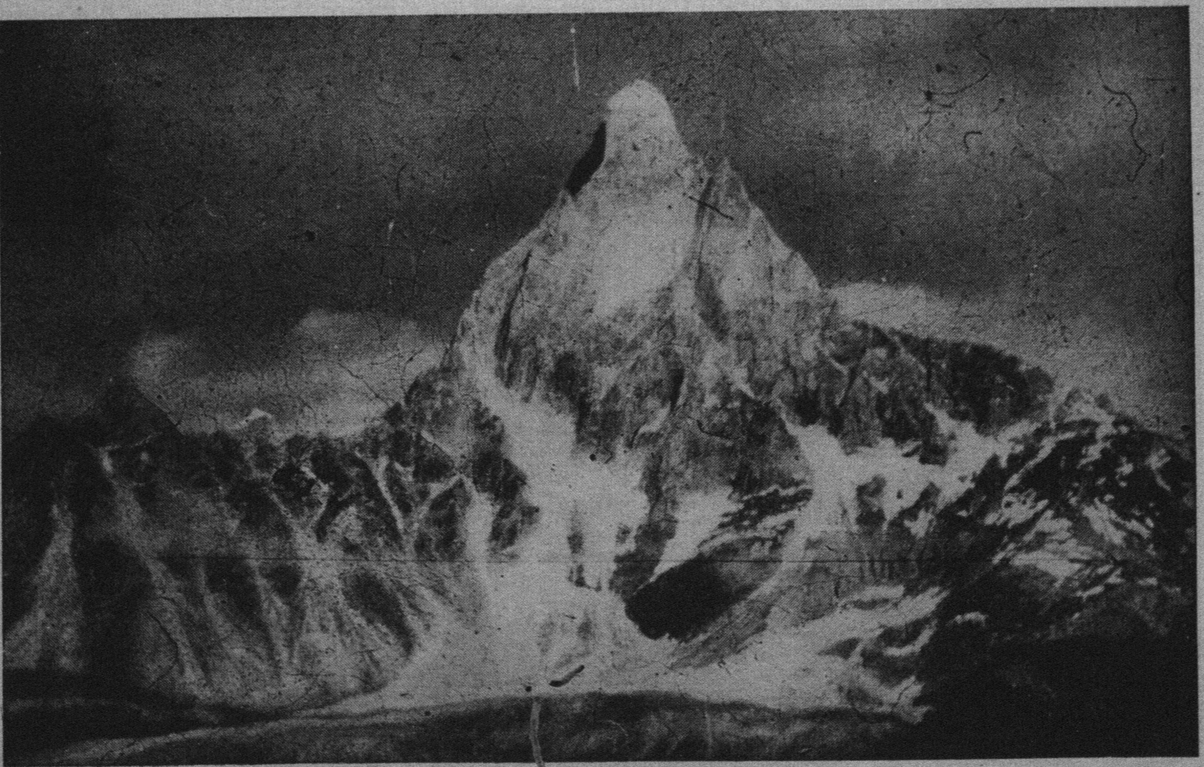




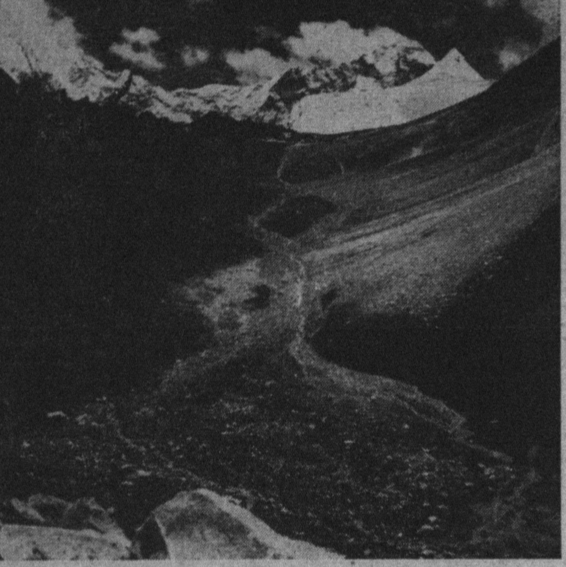
চতুরঙ্গী হিমবাহ হ'তে কেদারনাথ শিখর।



নন্দনবন হ'তে শিবলিঙ্গ শিখর।

# হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



নন্দনবন থেকে দক্ষিণের দৃশ্য,
ভাগীরথ ও অন্যান্য শিখরাবলী।
ফটো—ডাঃ বিশ্বাস



চতুরঙ্গী হিমবাহের একাংশ—
সবুজ জলের হিম-পুষ্করিণী, ভাঙা ভাঙা বরফের

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

মুদ্রক : ধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫।১, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৫



সুরালয় হিমবাহের তুষার-গহ্বর।
ফটো—ডাঃ বিশ্বাস



"কালিন্দী খালের উপর উঠে দাঁড়ালাম"

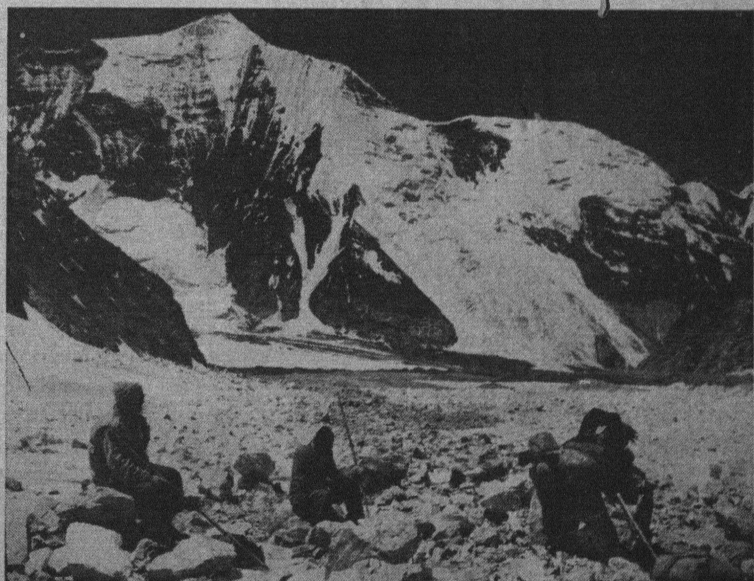


কালিন্দী খালে দাদা, লেখিকা ও সত্যেনবাবু।

( পিছনে রাক্ষস আশ্রয়দাতা শিখরটি )



অরোয়া নদীর ধারে প্রথম ক্যাম্প।
ওপারে ধসা পাহাড়।
ফটো—ডাঃ বিশ্বাস



অরোয়া নদীর ধারে বিশ্রামরত দাদা,

# ভূমিকা

১৯৫৩ সাল। হিমালয় থেকে ফিরেছি। বন্ধুবান্ধবদের সেই চিরন্তন কুতূহলী প্রশ্ন, কোন্‌দিকে ঘুরে এলে এবার? উত্তর দিই, গঙ্গোত্রী-গোমুখ থেকে বরফের পথে বদরীনাথ। ১৯,৫১০ ফুট উঁচুতে কালিন্দী পাসে রাত্রিবাসও হয়েছিল।

অবাক হয়ে সবাই তাকান্। মন্তব্য করেন, দার্জিলিং মুসৌরী সিমলা—এ-সব ত ছ'হাজার সাত হাজার ফুট। গঙ্গোত্রী, বদরীনাথ শুনেছি দশহাজারের কিছু ওপরে। আর গিয়েছিলে ১৯,৫০০-র ওপর। বলিহারি তোমার সাহস ও শক্তি। এই বয়সে সেখান থেকে ঘুরে এলে?

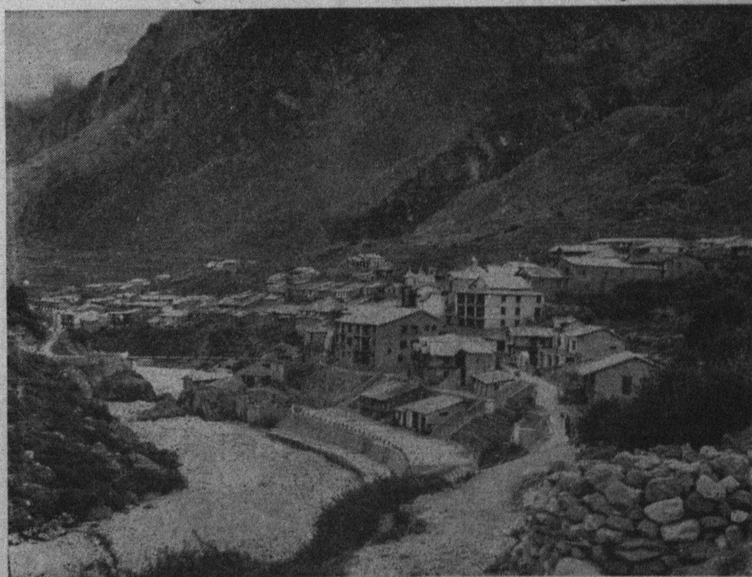
হেসে বলি, ঘুরে না-এলেই কি খুসী হতে? কিন্তু, কৃতিত্ব আমাকে একটুও দেবে না জানি, যখন প্রকৃত বৃত্তান্তটি শুন্‌বে। এবার গিয়েছিলাম ছোট দল বেঁধে। সঙ্গে ছিলেন এক মহিলাও। অমন অবাক্ হয়ে তাকাচ্ছ কি? হাঁ, মহিলাও। তিনিও ঘুরে এলেন ঐ দুর্গম পথে,—ভাল ভাবেই, মন-ভরা আনন্দ নিয়ে।

বন্ধুদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমার কাল্পনিক কৃতিত্ব নিমেষে কর্পূরের মতো উবে যায় মহিলার নামের হাওয়ায়। বিস্ফারিত নয়নে বলেন, বলো কি হে! বাঙালী মেয়ে? ঘুরে এলেন ঐ দুর্গম পথে, বরফের রাজ্যে! কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয় তাঁরই সম্বন্ধে।

হবার কথাও। হিমালয়ের সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র গঙ্গোত্রী-গোমুখ এবং বদরীনাথ। এই দুই তীর্থভূমি হিমালয়ের একই তুষার-গিরি শ্রেণীর পাদদেশে। বছরের ছয়মাস সেখানে বরফ পড়ে, অপর ছয় মাসে প্রায় গলে যায়। যাত্রীরাও যান্ সেই সময়ে। কেউ বা একই যাত্রায় চতুর্ধামও করেন। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী। সেই সাধারণ যাত্রা-পথে গঙ্গোত্রী থেকে মাল্লাচটিতে ফিরে পাওয়ালির প্রসিদ্ধ চড়াই ভেঙে ত্রিযুগীনারায়ণে নামা। তারপর কেদার ও তুঙ্গনাথ হয়ে বদরীনাথে আসা। গঙ্গোত্রী থেকে বদরীনাথের দূরত্ব সেই পথে হয় ২২২ মাইল। অথচ, যে তুষার শৈলশ্রেণীর নিম্নদেশে এই দুই তীর্থ, সেই হিমবান্ গিরিপ্রাচীর অতিক্রম করতে পারলে, দুই ক্ষেত্রের ব্যবধান



মানা গ্রামের নিকট সরস্বতী ও
অলকানন্দা নদীর সঙ্গম।
ফটো—ডাঃ বিশ্বাস



বদ্রীনাথ পেঁৗছে গেলাম—বাঁয়ে অলকানন্দা,

সামান্যই। মাপে হয়ত মাইল পঞ্চাশ মাত্র হবে। কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে গতানুগতিক মাইলের মাপে দূরত্ব বিচার হয় না। কতদিন সময় লাগতে পারে—অর্থাৎ পাহাড়ী ভাষায় কয় 'পড়াও'—সেইটেই বিবেচ্য। আবার সেই 'পড়াও'-ও নির্ভর করে যাত্রী বিশেষের শক্তি সামর্থ্যের উপর, ঝড়বৃষ্টি তুষারপাতের অনিশ্চয়তার উপর, গ্লেসিয়ার গুলির পরিবর্তনশীল ভয়াবহতার উপর। মাইলের মাপের কথা বলি। সাধারণ সহজ পথে ঘণ্টায় তিন চার মাইল অতিক্রম করা সকলেই অনুমান করতে পারেন। কিন্তু ঐ তুষার রাজ্যে তিন চার ঘণ্টা চলেও যখন শোনা যায়—'এই আধ মাইল টাক্ এলেন'—তখন মন বিশ্বাস কবতে চায় না। অথচ, দেহে ক্লান্তি বোধ হয়, যেন দশ পনেরো মাইল একটানা হেঁটে আসার। এ-অবস্থা ওখানকাব পক্ষে স্বাভাবিক। কেন না, পথ নেই, boulders-এর স্তূপ, পাথরের উপর থেকে পাথরে ডিঙিয়ে পা ফেলে চলা। নয়ত, বরফের উপর দিয়ে হাঁটা। তারই মাঝে চড়াই উৎরাই। এদিকে altitude-ও ক্রমেই বেড়ে চলে—ষোলো, সতেরো, আঠারো হাজার ফুট। সূক্ষ্ম বাতাস—rarefied air। অক্সিজেনের অভাব। সহজেই হাঁফ লাগে, মাথা ধরে, ন্যক্কার বোধ হয়, চোখে জল ঝরে, দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়। তবু আশ্চর্য! দেহে এতো গ্লানি, তারি মধ্যে মনে অপার আনন্দ। ক্ষণিক বিশ্রামে দেহে শক্তি ফেরে, মন ভরে ওঠে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে। পথের অপরিসীম ক্লেশ কোথায় মিলিয়ে যায়। দুস্তর গিরিপথ প্রিয় বন্ধুর মতো—হাত বাড়িয়ে যেন আবার টেনে নিয়ে চলে।

এ-পথে যাত্রী চলাচল নেই। সাধু সন্ন্যাসীরা কখন সখন যান্। পাহাড়ীরাও কচিৎ কখনো। আর আসেন পর্বত-প্রেমিক অভিযাত্রীদল। বিদেশীরা এসেছেন। জরীপের কাজেও বাধ্য হয়ে কয়েকজনকে যেতে হয়েছে। অভিজ্ঞ গাইড্ দিলীপ সিং-এর সংবাদ, নেপালী এক মহিলা তীর্থযাত্রী কয় বছর আগে এ-পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের সমতল ভূমির কোন মহিলা এর আগে গেছেন বলে শোনা যায় নি। তাই, বাঙ্‌লা দেশ থেকে ঐ দুরূহ পথে প্রথম মহিলার পদক্ষেপ শুধু আনন্দের কথা নয়, গর্বেরও বিষয়। এই কাহিনীর লেখিকা সৌভাগ্যবতী সেই মহিলা। এই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কৌতুহল অনিবার্য্য। যাত্রা-পথের অনেকখানি অংশ সীমান্ত অঞ্চলের নিকবর্ত্তী। তাই

restricted area—বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। পথে এক জায়গায় অনুমতি পত্রের দরখাস্তগুলি লিখতে হয় আমাকে। সঙ্গীরা তখন নিকটে ছিলেন না। লেখিকার স্বামী, ডাক্তার বিশ্বাসের বয়স আমার জানা ছিল—৫২ বৎসর। আন্দাজে লেখিকার বয়সও লিখে দিই—৪৪ বৎসর। তারপর তাঁকে খবরটা বলায় তিনি হেসে বলেন, একটু বেড়ে গেছে—৪২।

এই বয়সে তাঁর শক্তি সামর্থ্য, ধৈর্য্য, সাহসিকতা, মনের বল ও অসীম উৎসাহের যে অসাধারণ পরিচয় পথে পেয়েছি তা' প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এই যাত্রা-কাহিনীর মধ্যেও তার আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু, এরও আগের কথা আছে।

ডাক্তার বিশ্বাস আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। তাই সোদরপ্রতিম। তাঁর ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছি। তারপর অনেক বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই। শুনি, ডাক্তার হয়েছেন। সহরে প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের দরজা ঠেলে উঁকি মারেন। জিজ্ঞাসা করেন, আস্‌তে পারি ?

সাদরে আহ্বান করি, আরে তুমি ? এসো, এসো—বহুকাল দেখি নি, কেমন আছ ?

'চিন্‌তে পেরেছেন তাহলে ?' বলে চেয়ার টেনে বসে বলেন, একটা পরামর্শ করতে এলাম।

তারপর শুনি, সংসারের চিরন্তন করুণ কাহিনী। পুত্রশোক পেয়েছেন।

প্রশ্ন করেন, তাই এলাম দাদা, পরামর্শ নিতে। আপনার বৌমাকে নিয়ে একবার কেদার বদরী ঘুরে এলে কেমন হয় ? পার্‌বো ত আমরা ? আর, গেলে মনে কি কিছু শান্তি দেবে ?

নিঃসঙ্কোচে বলি, নিশ্চয় যাবে। এই তো ঘুরে এলাম। আবার যাবো। আমি যদিপারি, তোমরাও অনায়াসে পারবে। আর শান্তি ? আমার দৃঢ় ধারণা—তাও পাবে।

উৎসাহে ডাক্তার বিশ্বাস তখনি আয়োজনের শুরু করেন। ক'দিন পরেই সস্ত্রীক যাত্রাও করেন।

ফিরে এসেই দেখা করতে আসেন। এবার একা নয়—দুজনে। দুজনেরই মুখে আনন্দের দীপ্তি, মন ভরা তৃপ্তি।

বলেন, বড় ভালো লাগ্‌ল দাদা। খুব আনন্দ পেয়েছি—দুজনেই। এ যে এক নতুন জগতের সন্ধান পেলাম।

কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, এ শুধু শুরু। প্রতি বছরেই যেতে হবে।

পরের বছরের কথা। ক'দিনের জন্যে কলকাতায় আমি। হঠাৎ টেলিফোন,—দাদা, আমি মণি। খোঁজ রাখ্‌ছি রোজই, কবে পৌছুবেন। আবার চললাম যে দুজনে। আস্‌ছে সপ্তাহেই রওনা হব। সব তৈরি। এবার যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখও। যাবার আগে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু এবার একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ীতে একবার আসতে হবে—গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরাই যেতাম, কিন্তু উপায় নেই। আপনার বৌমার পায়ে প্লাস্টার! বাড়িতে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন, তাই এখনও অচল অবস্থা।

আশ্চর্য হই, তবে বলছ যে আস্‌ছে সপ্তাহে যাত্রা করছ?

দ্বিধাহীন উত্তর শুনি, তা তো করবই। ও বলছে, প্লাস্টার দুদিন পরেই খুলে দেবে ডাক্তার বলেছেন। ঠিক চলে যাব, বেরিয়ে ত পড়ি।

গিয়ে দেখি, চেয়ারে স্থাণু হয়ে চুপ করে বসে। কিন্তু মুখে হাসি, মনে অটল বিশ্বাস, যাত্রা সফল হবেই। প্রশ্ন করেন, গঙ্গোত্রী ত যাবই, গোমুখও যেতে চাই। পারবো তো? তাই বলুন।

ভাবি, আমি বলার কে? পায়ের আঘাতের বাধাই বা কি? যিনি নিয়ে যাবার ঠিকই নিয়ে যাবেন!

দুজনে নির্বিঘ্নে যাত্রা শেষ করে আবার আনন্দের পসরা নিয়ে ঘরে ফেরেন।

কিছুদিন পরেই দার্জিলিং মাউনটেনিয়ারিং ইন্‌সটিটিউট থেকে পাহাড়ে ওঠার বেসিক্ ট্রেনিংও নিয়ে আসেন শ্রীমতী বিশ্বাস।

তারপর নিয়মিত চলে প্রতিবছরই অন্ততঃ একবার করে হিমালয়ে পদযাত্রা। আবার বাড়ি ফিরে সহরের মধ্যে গৃহলক্ষ্মীর সংসার যাত্রা। কিন্তু মনোরাজ্যে সদাই হিমালয় বাস। হিমালয়ের বই, ছবি, ফটো, মুভি। তাঁর স্লিপিং ব্যাগ সাজ পোষাক ত আছেই। জল্পনা কল্পনা আলোচনা চলেছেই—এবার হিমালয়ের নতুন কোন্ দিকে? জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি যেন সারা বছর উন্মুখ হয়ে থাকে—কবে আবার হিমালয় যাত্রা!

বড় ছেলে মেরিন এঞ্জিনীয়ার। জাহাজ নিয়ে প্রায়ই বিদেশে যান্। বাড়ী এলে মা বাবার জন্য আনেন বিদেশ থেকে—হিমালয় যাত্রার সাজ-সরঞ্জাম, হিমালয় অভিযানের নতুন বই।

সেই লেখিকারই লেখা এই অভিনব-হিমালয়-কাহিনী। দুর্গম সেই অঞ্চলের। গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে গোমুখ। গঙ্গার উৎস মুখ। তারও উপরে বিশাল তুষার প্রান্তর; হিমগিরির ভীতিবহ উগ্র রূপ। কঠিন কঠোর। ভেঙে পড়া পাহাড়ের শিলাস্তূপ। বরফের অজস্র ফাটল। হিংস্র চাহনি। কোথাও বা Rock Falls কখনো বা Avalanche। প্রাণান্তকর চড়াই। সূক্ষ্ম আবহাওয়ার অস্বাভাবিক অস্বস্তি। সামান্য চলতেও দেহের অসীম অবসাদ। তুষার রাজ্যের প্রচণ্ড শীত। তারই মাঝে তাঁবুতে রাত্রিবাস। সেই পথে এগিয়ে চলে ছোট যাত্রীর দল,—বাঙালী এক মহিলাও। চারিপাশে বিপদ ও আতঙ্কের জাল পাতা। তবু, অবসন্ন দেহেও মনে শান্ত প্রসন্নতা। মাথার উপর মেঘহীন সুনীল আকাশ। পথের পাশে হিমবিগলিত স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারা। চারিদিকে নিষ্কলঙ্ক তুষারের শুভ্র শোভা ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের বিরাট মৌনতা। জনহীন নিঃসীম এক জগতের সুগভীর শান্তি মানুষের ক্ষুদ্র অন্তর পরিব্যাপ্ত করে রাখে! অভিযাত্রী নিজেকে হারিয়ে ফেলে, এই হারিয়ে ফেলার মধ্যেই অজানা কিসের এক সন্ধানও পায়। তাই বারবার ফিরেও আসে—হিমালয়ের এই দুর্নিবার আকর্ষণে।

লেখিকার নিখুঁত বর্ণনার মাঝে সেই হিমালয়-পথেরই আনন্দ ছড়িয়ে আছে। পড়তে বসে মনে হয়, আবার চলেছি সেই হিমগিরির সুদুর্গম পথে।

**উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

১৩৬৭
মধুপুর

# উপক্রমণিকা

**হিমালয় :** আমাদের যাত্রাপথের শুরু কলকাতা থেকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণের পরিপূর্ণ রসাস্বাদ করতে শুরু করেছি আমরা উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল জেলা থেকে। অর্থাৎ যেখানে আমাদের হাঁটাপথের শুরু হয়েছে। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে যাবার আহ্বান এসেছে মনের মধ্যে, তাই যাত্রা করবার উদ্যোগ আয়োজন করেছি। এবার যাবো মাতৃরূপিণী ভাগীরথী ও তার উপনদী অলকানন্দা, মন্দাকিনী, ধৌলী, সরস্বতী যে অঞ্চলে জন্ম নিয়েছে—সেই রাজ্যে। হিমালয়ের তুষার অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এইসব নদীগুলির উৎস,—তাই আমরা হিমালয়কেই সর্বপ্রথম চিনবার চেষ্টা করছি।

হিমালয় আমাদের স্বপ্নের রাজ্য। দূর থেকে আমরা সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তার হিমবান্ শৈলশিখরকে, নিকটে গেলে তার বিশালত্বে আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। অগণ্য নদীর জন্ম হয়েছে হিমালয়ের অসংখ্য হিমধারা থেকে—সমগ্র ভারতের উত্তরাখণ্ড বেঁচে আছে হিমালয়ের স্নেহসলিলে।

কি বিস্ময় জেগে ওঠে মনে, যখন বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শুনতে পাই যে সৃষ্টির বহু পরেও যখন দক্ষিণ ভারতের অস্তিত্ব ছিল, ছিল অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা মহাদেশ, তখন হিমালয় ছিল না! মানুষের জন্ম হয়নি, সমুদ্র পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগ জুড়ে বিরাজমান ছিল। অসীম সাগরে যেন ভাসমান দুটি ভূখণ্ড এক আশ্চর্য শক্তির আকর্ষণে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তাদের আকর্ষণের ফলে সাগরে নিমগ্ন ভূখণ্ড ধীরে ধীরে মাথা তোলে—উঁচু হয়ে ওঠে হিমালয়, তার বিরাট রূপ নিয়ে। ক্রমে ক্রমে তরলাংশ শুকিয়ে জমে কঠিন হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে। সাগরের গর্ভের স্তরে স্তরে জমে থাকা সাগরের প্রাণীদের হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে শিখরে জীবাশ্মের বা ফসিলের আকারে দেখতে পাওয়া যায় এখনো। এমনি শিলীভূত জীব বা

'ফসিল' আমরা পেয়েছি নেপালে কালীগণ্ডকী নদীর উৎস-মুখে। তাকে স্থানীয় লোকেরা বলে শালিগ্রাম শিলা, রঘুনাথ শিলা। এগুলির কোন কোনটি হিন্দু ব্রাহ্মণগণ পূজ্যবস্তুরূপে ব্যবহার করেন।

হিমালয়ের সন্নিহিত ভূভাগের ছোট-ছোট পাহাড়গুলির আকৃতি হিমালয়ের জন্মের পর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রতি বৎসর সাগর হতে জলভরা মৌসুমী বায়ু উত্তরে বয়ে গিয়ে এই বিশাল পর্বতে বাধা পেয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। বৃষ্টির আঘাতে হিমালয়ের আকৃতিরও পরিবর্তন হতে থাকে, কিন্তু এই বিরাট পর্বতমালা মৌসুমী বায়ুকে পার হতে বাধা দেয়—তাই ওপারে তিব্বতের উচ্চ ভূখণ্ডে এই বায়ু প্রবেশ পথ না পাওয়াতে সেখানে কমই বৃষ্টিপাত ঘটে। সেখানকার ভূখণ্ডের আকৃতিরও তাই পরিবর্তন হয় না। সেইজন্য সেখানে ২০,০০০ ফুট উচ্চভূমিতেও সাগরের প্রাণীদের জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়। এইসব প্রাণী এককালে ছিল সাগরের তলদেশে।

হিমালয়ের জন্মের আগে দক্ষিণ ভারতের যে ভূভাগের অস্তিত্ব ছিল, তারই সমান্তরালে ক্রমবিন্যস্ত হলো হিমালয় পর্বতমালা। এই বিশাল পর্বতমালা উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে গঙ্গানদীর অববাহিকার মধ্যবর্তী ভূভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। একে সাধারণতঃ তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। সর্বদক্ষিণে আছে শিবালিক পর্বতশ্রেণী—সবচেয়ে নীচু পর্বতমালা, পশ্চিমে পঞ্জাব থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ পর্বতমালার মধ্যে মধ্যে আছে বিরাট বিরাট সমতল ভূখণ্ড বা 'দূন'। কোন কোন দূন ২০-৩০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। শিবালিক পর্বত ভারতের পশ্চিমে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদী থেকে পূর্বে আসামের ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ। মধ্যে কেবল নেপালে কোশীনদী থেকে ভূটানের মানসনদী পর্যন্ত ২০০ দুইশত মাইল অংশে এর কোন অস্তিত্ব নেই। প্রবল বারিপাতের ফলে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শিবালিক পর্বতমালা গঙ্গার অববাহিকা থেকে কোথাও ৩,০০০ তিন হাজার ফুটের অধিক উঁচু নয়। ঘন জঙ্গলে আবৃত, তাই বাঘ, চিতা, ভালুক ও অন্যান্য বন্যজন্তুর আবাসস্থল এই অঞ্চল।

শিবালিকের উত্তরে আছে Lesser Himalayas বা নিম্ন হিমালয়। এই অঞ্চল প্রায় ষাট মাইল প্রশস্ত। শিবালিক পর্বতমালার সঙ্গে পশ্চিম থেকে

পূর্বে প্রায় সমান্তরালে এই পর্বতমালা চলেছে। এখানকার পর্বতের গঠন কোথাও সহজ বা সরল নয়। হিমালয় থেকে নির্গত অগণ্য নদী পর্বতমালা ভেদ করে মধ্য দিয়ে পথ করে বয়ে চলেছে, ফলে এই অঞ্চলে পর্বতমালাও নানা প্রকার বিচিত্র আকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। এখানকার পর্বতশৃঙ্গগুলি সাধারণতঃ গড়ে ১৫,০০০ পনের হাজার ফুট উঁচু। যত উত্তরে যাওয়া যায়, শৃঙ্গগুলির উচ্চতা ক্রমশঃ বেশী হতে থাকে। এই নিম্ন হিমালয়ে বিশেষ করে বর্ষার সময় প্রায়ই পাহাড়ী ধস নামে এবং পার্বত্য পথ-ঘাট-ব্রীজ এই ধসের মুখে ভেসে যায়। এই অঞ্চলে ঘন জঙ্গলে আবৃত। যত উঁচুতে যাওয়া যায় পাইন, ফার, দেওদার প্রভৃতি কৌনিক গাছের শোভায় বনাঞ্চল অপরূপ হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের এই সৌন্দর্যের সাথে সাথে অজস্র দেওদার বৃক্ষ পাওয়া যায়—দেওদার অতি মূল্যবান বৃক্ষ। হিমালয়ের এই অঞ্চলেই আছে মানুষের তৈরী অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পার্বত্য সহর—মারী, ডালহৌসী, সিমলা, মুসৌরী, রাণীক্ষেত, আলমোড়া, নৈনীতাল, দার্জিলিং প্রভৃতি।

হিমালয়ের সর্বশেষ অংশ বৃহৎ হিমালয় ( Great Himalayas )। এই অঞ্চলটিও শিবালিক পর্বতমালার সাথে প্রায় সমান্তরাল পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত; যদিও কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও আছে। এইটিই হিমালয়ের সর্বপ্রধান অংশ। পর্বতমালার কেন্দ্রস্থল এই অংশেই অবস্থিত। বৃহৎ হিমালয়ের হিমবাহ থেকেই উদ্ভূত হিমালয়ের বড় বড় নদীগুলি কঠিন পর্বত ভেদ করে সমতলের দিকে নেমে এসেছে। বিশেষতঃ গঙ্গা এবং তার উপনদী-গুলির জন্ম এই বৃহৎ হিমালয়ের হিমবাহ থেকেই। বৃহৎ হিমালয়ের পর্বত-শৃঙ্গগুলির অধিকাংশই আঠারো হাজার ফুটের বেশী উঁচু। নদীগুলি পর্বতমালাকে কেটে কেটে যেখানে গভীর খাতের সৃষ্টি করেছে, সেই পথগুলি ছাড়া অন্যত্র সাধারণভাবে এই অঞ্চল উঁচু।

বৃহৎ হিমালয়ে আছে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি। পশ্চিমে সিন্ধুনদীর উত্তরে আছে বিখ্যাত নাঙ্গাপর্বত ( ২৬,৬২০ ফুট ); গঙ্গার দুটি উপনদী অলকানন্দা ও গৌরীগঙ্গার উপত্যকার মধ্যবর্তী প্রদেশে আছে ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবী ( ২৫,৬৪৫ ফুট ); নেপালে আছে ধৌলাগিরি ( ২৬,৭৯৫ ফুট ) ও অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ ( ২৬,৪৯২ ফুট )—এই দুটি শৃঙ্গের মধ্যেকার উপত্যকা দিয়ে কালীগণ্ডকী নদী বয়ে চলেছে; তিব্বত ও নেপালের সীমান্তে

আছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯,০২৮ ফুট) ও মাকালু (২৭,৭৯০ ফুট); নেপাল ও সিকিম সীমান্তে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৬ ফুট) এবং সবচেয়ে পূর্বে আছে আসামের নাম্‌চা বারোয়া (২৫,৪৪৫ফুট)। বৃহৎ হিমালয়ে (২৫,০০০) পঁচিশ হাজার ফুটের অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট একত্রিশটি শৃঙ্গ আছে তার মধ্যে বারোটি ছাব্বিশ হাজার (২৬,০০০ ফুট) ফুটের অধিক উঁচু।

আগেই বলেছি, বিশাল হিমালয়ের বিরাট দেয়ালের মত প্রতিরোধ ভেদ করে, মৌসুমী বায়ু খুব অল্পই উত্তরে যেতে পারে। তাই হিমালয়ের সন্নিহিত দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তিব্বত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত, সেখানে বৃষ্টি খুবই কম। কাশ্মীরের উপত্যকা কেবল মাঝামাঝি। পীরপাঞ্জালের পর্বত-মালা এখানকার মৌসুমী প্রতিরোধ করে বটে, কিন্তু বর্ষাকালে সেখানেও কিছু কিছু মেঘাড়ম্বর ও বৃষ্টিপাত দেখা যায়। শীতকালে পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর থেকে আগত মৌসুমী বায়ু প্রধানতঃ হিমালয়েব বিরাট তুষার-সম্পদের সৃষ্টি করে।

# হিমালয়ের হিমবাহ

বৃহৎ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরগুলিতে বায়ুবাহিত জলকণা হিমকণারূপে জমে ওঠে, শুভ্র করে তোলে শিখরগুলিকে। ক্রমে ক্রমে জমে ওঠা এই তুষার ধীর প্রবাহে নীচের দিকে নামতে থাকে স্থিতাবস্থা লাভের আশায়। শৃঙ্গগুলির আশে-পাশের খাঁজে খাঁজে জমে ভরে ওঠে তুষার স্তূপ। বর্ষা ও শীত ঋতুর তুষারপাতে এই তুষার স্তূপ আরও বিপুল ও ঘন হয়ে ওঠে। কিন্তু, এই তুষার স্থিতিশীল হয় না। ধীর গতিতে চলা শুরু করে দেয় মাধ্যাকর্ষণের টানে। যেন তুষারের স্রোত—তুষারনদী। পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসে এই স্রোত, সৃষ্টি হয় হিমবাহের। উঁচু পর্বত থেকে নেমে আসা ছোট হিমবাহগুলি একত্র মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে বড় হিমবাহের, যেমন ছোট ছোট ঝরনার মিলনে তৈরী হয় বিশাল নদী।

হিমবাহের তুষার ক্রমশঃ জমে শক্ত হয়ে ওঠে। এই জমাট শক্ত তুষারের একটা গতি আছে, সে গতি অতি ধীর। চোখে দেখে বোঝা যায় না, মনে হয় নিশ্চল। চলার সময় এই তুষার সর্বত্র সমগতিতে চলতে পারে না। পর্বতগাত্রে ঘর্ষণের জন্য অসমান গতি প্রাপ্ত হয়। প্রবাহের মধ্যাংশের গতি সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, ফলে শক্ত তুষারে ফাটল ধরে।

উপরের তুষারের বিরাট স্তূপের চাপে নীচের তুষার গলতে শুরু করে, ফলে হিমবাহের তলা দিয়ে এক জলধারা বয়ে চলে। দিনমানে সূর্যের উত্তাপে উপরিভাগের তুষারও গলে গলে ফাটল দিয়ে নিঃসৃত হয়ে নীচের অদৃশ্য ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বয়ে চলে। তাই হিমবাহের উপরে যেমন থাকে শক্ত শুভ্র তুষারধারা, নীচে থাকে শান্ত-শীতল এক অদৃশ্য জলধারা।

হিমবাহ এমনি ধীরে ধীরে নামতে নামতে অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায় হিমরেখাতে ( Snow-line )। এখানে তুষার-জমা ও গলার পরিমাণ সমান হয়ে দাঁড়ায়। অদৃশ্য প্রবহমান জলধারা সেইখানে নদীরূপে আত্মপ্রকাশ

করে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ পবিত্র তীর্থ গোমুখের তুষার গহ্বর থেকে সেইমতই ভাগীরথীর আবির্ভাব হয়েছে।

পর্বতশিখরের উপর তুষারের শক্তি অতি অসাধারণ। তুষার পতনের ক্রমাগত আঘাতে পর্বতশীর্ষ ধারাল তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে। তুষারপাতের পর হালকা তুষার ধীরে ধীরে পাথরের ফাটলে প্রবেশ করে, ফলে পাথরগুলি আলগা হয়ে আসে। সূর্যকিরণে তুষার গলে জল হয়ে গেলেই এগুলি তার সাথে সাথে গড়িয়ে পড়ে। হিমালয়ের বিরাট বিরাট ধস নামবার এই এক কারণ। হিমবাহের চলার পথে এইজন্য যেমন তুষার থাকে, তেমনি থাকে পর্বত-গাত্র থেকে খসে আসা বালি পাথর। তুষারের গতির সঙ্গে সঙ্গে এই পাথরগুলিও ধীর গতিতে চলতে থাকে। তাই তুষারের শুভ্র-সুন্দর রূপ ঢাকা পড়ে যায়, বালি পাথরের তলায়, ভূবিজ্ঞানে যাকে moraine বলে। হিমবাহ চলে অতি ধীর গতিতে, তাব দুই তীরে জমে ওঠে বালি পাথরের রেখা, একে বলে Lateral moraine। হিমবাহের তুষারের স্রোতের উপরও গড়িয়ে গড়িয়ে পাথর জমে মধ্যখান দিয়ে যে রেখার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে medial moraine। হিমবাহের তুষারের চলা তাই কেবল নিষ্কলুষ তুষারের চলা নয়, সাথে থাকে অজস্র বালি, কাঁকর, পাথর মেশানো, নীচে থাকে প্রবল জলস্রোত। এই জলস্রোতেও কিছু কিছু পাথর বালি বহন করে চলতে থাকে অদৃশ্যে অগোচরে। তা কেবল দৃশ্য হয় যখন জলস্রোত নদীরূপে হিমবাহের শেষ-প্রান্তে আত্মপ্রকাশ করে তখনই। এইখানে এইরূপে বাহিত বালি, পাথর ক্রমাগত জমতে জমতে ছোট ছোট টিলার আকারে দেখা দেয়। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে Terminal moraine.

হিমবাহ আর একটি রূপে দেখতে পাওয়া যায়। উত্তুঙ্গ দুই পর্বতের মাঝখানে হিমবাহ অখণ্ড হিমধারা রূপে চলে, কিন্তু সেই চলবার পথের ঢাল যদি বেশী হয়, তবে হিমবাহ আর সমান থাকতে পারে না। ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে নামতে হয় সেই তুষার-ধারাকে। যেমন ঝরনা—নদীর গতিপথে উত্তুঙ্গ শিখরের থেকে ঝাঁপ দিয়ে। এইরূপ হিমধারার নাম Ice-fall বা হিম-প্রপাত।

হিমবাহের আরেকটি ভয়ঙ্কর রূপ চোখে পড়ে। পর্বতের উচ্চ প্রদেশে ক্রমাগত তুষারপাতের ফলে উঁচু হয়ে জমে ওঠে তুষারস্তূপ। এই তুষার যখন

বিপুলায়তন হয়ে দাঁড়ায় তখন নিজের ভারে তারই তলার জল গলে যায়, কখনো বা ভারসাম্য হারিয়ে সেই বিরাট তুষারস্তূপ বিদ্যুৎ গতিতে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। তখন তার গতিপথে যা থাকে সমস্ত সেই স্রোতে ভেসে গিয়ে তুষারস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায়। বজ্রগর্জনের মত গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারস্তূপের স্খলন অতি ভয়ঙ্কর। একেই পর্বতারোহীরা বলেন Avalanche. Avalanche-কে তাঁরা অত্যন্ত ভয় করেন, সর্বদা সযত্নে এড়িয়ে চলেন তার চলবার পথ।

হিমালয়ের হিমবাহগুলি কালের প্রবাহে যদিও বহু সঙ্কুচিত হয়ে গেছে তবু একমাত্র মেরুপ্রদেশকে বাদ দিলে এখনো এখানকার হিমবাহই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়। পামিরের Fed-chenko ও Sia chen আটচল্লিশ মাইল ও পঁয়তাল্লিশ মাইল দীর্ঘ। এই দুটি পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ। অন্য হিমবাহগুলি এত বড় না হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নাঙ্গা পর্বতের কতকগুলি, কুমায়ুনের বদরীনাথ পর্বত থেকে আগত কয়েকটি ও সিকিমের কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমবাহের কোন কোনটি ষোল থেকে আঠারো মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। পশ্চিমাঞ্চলের হিমবাহগুলি সিকিম ও কুমায়ুনের হিমবাহ থেকে বৃহত্তর তো বটেই, পরন্তু সেগুলি অনেক নীচে অবধি নেমে এসেছে। কাশ্মীরে কোথাও কোথাও দেখা যায় যে হিমবাহ (৭,০০০-৮,০০০) সাত আট হাজার ফুট পর্যন্ত নেমে এসেছে, কুমায়ুনে মাত্র (১২,০০০) বার হাজার ফুট নীচে এবং কাঞ্চনজঙ্ঘাতে মাত্র (১৩,০০০) তের হাজার ফুট নীচে। অক্ষাংশের উচ্চতা এই অসামঞ্জস্যের কারণ হওয়া সম্ভব, কেননা পশ্চিমের কারাকোরাম পর্বত ৩৬° অক্ষাংশে অবস্থিত এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮° অক্ষাংশে অবস্থিত। আরেকটি কারণ হিসাবে ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে, পূর্বাঞ্চলে মৌসুমীবায়ুর প্রবেশ পথ সহজ। এইজন্য পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতও অধিক, কিন্তু এখানকার বায়ু উষ্ণতর। পশ্চিমাঞ্চলে খুব সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু শীতকালে তুষারপাত অধিক হয়। হিমালয়ের দক্ষিণের হিমবাহগুলির হিমরেখা (Snow line) পূর্বাঞ্চলে (১৪,০০০) চোদ্দ হাজার ফুট থেকে ক্রমে ক্রমে বেড়ে পশ্চিমাঞ্চলে (১৯,০০০) উনিশ হাজার ফুট পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। উত্তরে তিব্বতে এই হিমরেখা আরও (৩০০) তিনশো ফুট উঁচু, যদিও আরও উত্তরে এমন নয়, সেখানকার বৃষ্টিপাত মোটামুটি নিয়মিত। লাডখের হিমরেখা (১৮,০০০) আঠারো হাজার ফুট।

বৃহৎ হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য এই উত্তুঙ্গ হিমাচ্ছাদিত সৌন্দর্যময় শিখরগুলি এবং এই অঞ্চলের হিমবাহসকল। এইসব হিমবাহ থেকে জন্ম হয়েছে ভারতের বড় বড় নদীগুলির—বিশেষতঃ গঙ্গা ও তার উপনদীগুলি। তাই এই হিমবান হিমশৈল যে কেবল সৌন্দর্য পরিপূর্ণ দেবতার ভূমিরূপে ভারতের অধিবাসীদের নিকট পূজা পেয়ে আসছে তা নয়, ইহা ভারতের প্রাণস্বরূপা গঙ্গা নদীর উৎসস্থল।

* * *

এই বিশাল হিমালয়ের সর্বত্র মানুষের পক্ষে যাতায়াত করা খুবই কষ্টসাধ্য। সাধারণভাবে বলা যায় যে এখানে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন আগে খুব কমই ছিলো; কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রয়োজন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরেও হিমালয়কে অতিক্রম করা এত কষ্টসাধ্য যে ওর ওপারে কি আছে জানবার আকাঙ্ক্ষা দমন না করে উপায় ছিল না। কাশ্মীর উপত্যকার ওপারে মালবহনের জন্য ভারবাহী পশু পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে না, সেখানে কেবলমাত্র মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা সম্ভব। তাই, সেই অঞ্চলে যে সামান্য বাণিজ্য বর্তমান, সে কেবলমাত্র মানুষের জন্যই সম্ভব হয়েছে, ঘোড়া, খচ্চর, চমরী এমনকি ভেড়া পর্যন্ত সেখানে অচল। এই অঞ্চলের অনেকস্থানে মনে হয়, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বৎসরের অন্য সময় এরোপ্লেনে যাতায়াত সম্ভবপর, কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে দেখা যায় যে, প্লেন নামবার স্থানাভাব, বিশেষ করে উচ্চতার জন্য বাতাস হালকা হওয়াতে উড়বার পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেবল প্রাথমিক পরীক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন কারণে প্লেনের ব্যবহার করাও তাই চলে না।

তবে চিরকালই হিমালয় সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। তাই বহু প্রাচীনকাল থেকে যেখানে জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত যেতে পারেনি, তেমনি দুর্গম পথ দিয়ে চৈনিক তীর্থযাত্রীরা প্রাণসংশয় করে বুদ্ধের দেশের খোঁজে এসেছেন। হিন্দুগণ গিয়েছেন তাঁদের পরম পবিত্র গঙ্গামায়ের উৎস সন্ধানে—শিবের বাসভূমি কৈলাস পর্বতের খোঁজ করতে। তাঁরা এইরকম দুর্গমস্থানে তাঁদের ধর্মানুযায়ী মন্দিরাদি কতকাল আগে নির্মাণ করে রেখে গেছেন, তার সত্যকার ইতিহাস দুর্লভ। সত্যি বলতে কি, এই হিমালয় হ'ল জগতের তিনটি বৃহৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মিলনস্থান, এ সাম্রাজ্য তথাকথিত সাম্রাজ্য

বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়, এ হ'ল ধর্মসাম্রাজ্য। সিন্ধুনদীর জটিল উপত্যকাতে আছে ইসলাম, হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত উপত্যকাগুলির আশে-পাশে হিন্দুধর্ম এবং তিব্বত ও লাডাকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত। তিব্বত থেকে এই বৌদ্ধধর্ম যেন হিমালয়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে এসে নেপালের হিন্দুকৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে। জাতিগতভাবে যদিও অধিকাংশ সময় রাজপুতেরাই এইসব অঞ্চল শাসন করেছেন, কিন্তু এখানকার সাধারণ বাসিন্দাদের অধিকাংশই মোগল বা মোঙ্গলজাতীয়। লাডাক ও সিকিমে ভারতীয় বা ইসলামী সভ্যতার আবহাওয়ার চিহ্নও দেখা যায় না। কৃষ্টিগত পার্থক্য কেবল যে বৌদ্ধমন্দির এবং তাদের ধর্মচক্রতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, এদের অর্থনীতিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এই অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষির উপরই নির্ভরশীল। কার্যক্ষেত্রে এদের জীবনধারার সঙ্গে কিন্তু যাযাবর মেষপালকের জীবনযাত্রার মিল দেখা যায়। এইজন্য এদের সামাজিক ব্যবস্থাও অন্য রকম। যেমন লাডাকে বহুভর্তৃকা প্রথা সুপ্রচলিত অর্থাৎ একই পরিবারের একাধিক ভাইয়েরা একজন স্ত্রীকে গৃহিণী হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু হিমালয়ের দক্ষিণে এই নিয়ম নেই বললেই চলে। হিমালয়ের দক্ষিণের অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের বিশাল সমভূমির অধিবাসীদের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হ'ল এই যে এরা কেবল পার্বত্য মানুষ নয়, এরা পর্বতারোহী।

এই দুর্গম-দুস্তর রহস্যময় রাজ্য ভারতবাসীকে অনন্তকাল ধরে আকর্ষণ করেছে। এইজন্য এই দেশে কৈলাস শিখর ও গঙ্গার উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিবপার্বতীর রমণীয় উপাখ্যান। চিরতুষারময় শিখর আমাদের নিকট নির্মল পবিত্রতার প্রতীক। এইমত পবিত্রতা লাভ করতে হলে চাই অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। হিমালয়কে অপরিবর্তনশীল মনে করে কালিদাস প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন কবিগণ শক্তিমান দেবতার আবাস বলে বর্ণনা করেছেন। এই দেবতা পৃথিবীর সাম্য বজায় রাখেন, রাখেন স্থিতাবস্থা তাঁর দৃঢ়শক্তি দ্বারা অবিচলিতভাবে।

# কুমায়ুন

কুমায়ুনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কেননা এই অঞ্চলেই আছে মাতৃরূপী গঙ্গানদীর উৎস। গঙ্গানদীর বহু শাখা-প্রশাখা বন্দরপুছ, পর্বত ও নন্দাদেবী পর্বতমালার মধ্যবর্তী প্রদেশে অবস্থিত হিমবাহ থেকে জলসঞ্চয় করে নির্গত হয়েছে। এই প্রদেশের মোটামুটি পশ্চিমে আছে যমুনা নদী এবং পূর্বে নেপালের পশ্চিম সীমান্তের মহাকালী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আরও বহু জলবাহী উপনদী আছে, এদের কোন কোনটি বৃহৎ হিমালয়েরও উত্তর থেকে বেরিয়েছে। গঙ্গানদীর এই সকল উপনদীগুলি খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বে প্রাচীন আর্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা এইসব নদীর উৎপত্তিস্থলে গিয়ে হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রাজনৈতিক হিসাবে কুমায়ুনের উত্তর প্রদেশ ( আলমোড়া, গাড়ওয়াল ও নৈনীতাল জিলা ), দেরাদুন জিলা ও টিহরী গাড়োয়াল, এই কয়টি জেলা নিয়ে কুমায়ুন গঠিত। টিহরী এখন ইউ-পির সহিত যুক্ত হয়েছে। আয়তন ১২,৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২,২৫০,০০০। সমগ্র দেশটি ১৮১৪-১৫ সালে নেপালী গুর্খাদের হাত থেকে দখল করা হয়েছিল।

এই প্রদেশ দক্ষিণে শিবালিক পর্বতমালার নিম্ন ভূভাগ থেকে আরম্ভ হয়ে উত্তরে বিশাল হিমালয়ের অগণ্য হিমবাহ শোভিত শৃঙ্গমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালার মধ্যে আছে কেদারনাথ ও বদরীনাথ গিরিশ্রেণী (২২,০০০-২৩,০০০ ফুট )। এদের বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখান থেকেই উদ্ভূত অগণ্য স্রোতস্বিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী ও অলকানন্দার জন্য জলবহন করে। এই দুটি নদী গঙ্গার প্রধান উপনদী। এই কারণেই এই প্রদেশের ধূলিও পুণ্যময়।

অলকানন্দার উত্তরে আছে কামেটশৃঙ্গ ( ২৫,৪৪৭ ফুট ) ও পূর্বে আছে

ত্রিশূল, নন্দাকোট (২২,৫১০ ফুট) ও নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফুট)। নন্দাদেবী ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ।

অলকানন্দার প্রধান উপনদী দুইটি। নিতিপাশ থেকে প্রবাহিত জাস্কার পর্বতমালা থেকে নির্গত ধৌলীনদী ও মানা পাশের নিকট থেকে নির্গত সরস্বতী। বদ্রীনাথের নিকট মানাগ্রামে সরস্বতী নদী এবং যোশীমঠের নিকট বিষ্ণুপ্রয়াগে ধৌলী নদী অলকানন্দার সহিত মিলিত হয়েছে। নন্দাদেবী ও বদরীনাথ পর্বতমালার মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে অলকানন্দা বয়ে গেছে। পিণ্ডারনদী (অন্য নাম কর্ণগঙ্গা) নন্দাদেবী ও পূর্বত্রিশূল হতে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং কর্ণপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে। আরও কিছু দূরে, পশ্চিমে গেলে দেখতে পাই অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম—ঠিক বদরীনাথ ও কেদারনাথের দক্ষিণে। এটির নাম রুদ্রপ্রয়াগ। ত্রিশূল পর্বতের পশ্চিম ঢালে নন্দপ্রয়াগ—নন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম।

পশ্চিমদিকে অবস্থিত গঙ্গার প্রধান উপনদী ভাগীরথী। কেদারনাথের পিছনে অবস্থিত। ভাগীরথী গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষপ্রান্ত গোমুখ (১২,৭৭০ ফুট) থেকে নির্গত হয়েছে। সর্বপশ্চিমে আছে জাহ্নবী নদী। পর্বতমালার উত্তরদিকে আরও কিছুটা দূর থেকে বের হয়ে পুণ্যভূমি গঙ্গোত্রী তীর্থের সাত মাইল নীচে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়েছে। গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী আঠারো মাইল নীচের দিকে অবস্থিত। ভাগীরথী ও জাহ্নবীর মিলিত ধারা হিমালয়ের বন্দরপুছ (২০,৭২০ ফুট) ও শ্রীকণ্ঠ (২০,১২০ ফুট) মধ্যবর্তী প্রদেশ ভেদ করে প্রবাহিত হয়েছে। পর্বতশৃঙ্গগুলির তের হাজার ফুট নীচ দিয়ে নদীর গতিপথ। এখানে ভাগীরথীর প্রবাহের পথ খুব খাড়া দুটি সমান্তরাল দেয়ালের মধ্য দিয়ে। দেখলে মনে হয়, পর্বতকে কে যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে সেই চলার পথ তৈরী করেছে।

অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম পুণ্যময় তীর্থস্থান দেবপ্রয়াগ। মিলিত ধারা—গঙ্গা। উচ্চভূমি থেকে হরিদ্বারে গঙ্গার প্রথম সমতল ভূমিতে অবতরণ। এখানে গঙ্গার চলার পথ শিবালিক পর্বতমালার মধ্য দিয়ে। আরও নীচে গঙ্গার অববাহিকা মোটামুটি সমতল ভূমির উপর। গঙ্গার প্রবাহের ফলে ভারতীয় গাঙ্গেয় উপত্যকা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। এখানে অতি প্রাচীন কাল থেকেই গঙ্গার তীর ধরে ধরে অগণ্য নগর গড়ে উঠেছে।

# হিমবাহ পথে বদ্রীনাথ

আমাদের যাত্রা শুরু কলকাতা থেকে। চিঠির উত্তর এসেছে। স্বামী সুন্দরানন্দজী লিখেছেন, দুরু দুরু বক্ষে খাম ছিঁড়ে খুলে পড়ি সে চিঠি।

"অতি দুর্গম পথ। এপথে সচরাচর কেউ আসে না। ভয়ঙ্কর তাই সকলেই ভয় পায়, আপনাদের আসবার ইচ্ছে হয়েছে জেনে সুখী হয়েছি। আমার যতটুকু সাধ্য আছে সাহায্য করবার তা করব। কিন্তু মনে রাখবেন বরফে চলতে হবে. বরফে শুতে হবে। পদে পদে মৃত্যু তার করাল বদন 'হাঁ' করে আছে। যদি এপথে আসেন, সব জেনেশুনেই আসবেন। জানানো প্রয়োজন বলে আমি বলছি। আরও বলছি, প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলে তবেই আসুন, বিন্দুমাত্র প্রাণের ভয় থাকলে আসবেন না।"

অন্তরে কিসের আকর্ষণ অনুভব করছি কে জানে! কে যেন ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে পাঠায়। বুঝতে পারি না, সে অজানার আকর্ষণ না দুর্গমের আহ্বান! কিন্তু তেমন ডাকে সাড়া দেওয়া, সে তো যৌবনের ধর্ম! আমাদের চারজনের কেউই অল্পবয়সী নই, বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছেন কেউ কেউ— তবে? একথার উত্তর কোথায় পাব?

সকলে স্তব্ধ হয়ে এর ওর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু চলা যে স্থির হয়ে গেছে! আমাদের করবার কি আছে? চলতেই যদি হয়, তবে বেশী ভয় ভাবনা না করাই ভালো।

এপথ যে ভয়ঙ্কর হতে ভয়ঙ্করতর, সে কথা আমাদের জানতে আর বাকী আছে কি! স্বামীজীকে দলপতি করে আমরা যে মাত্র দুই বছর আগে গোমুখ ঘুরে এসেছি, সে পথের অবর্ণনীয় কষ্ট তো ভুলবার নয়। কিন্তু যা পেলাম, সে কথাই বা কী করে ভুলবো। অসীম আনন্দে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দেখেছি, যে সৌন্দর্য দেহের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়, বারবার আকর্ষণ করে আনে ওই দুর্গম পথে।

দিন স্থির হোল। ৩রা জুলাই, ১৯৬৩—কলকাতা ছেড়ে ট্রেনে রওনা হলাম। যে গঙ্গা উত্তরাপথের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, লালন করেছে, তারই অববাহিকা ধরে আমাদের পথ চলেছে। বর্ধমান, হাজারিবাগ, গয়া, বারাণসী লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ প্রভৃতি পার হয়ে সবশেষে পৌছলাম হরিদ্বারে। দুদিনের পথ, আনন্দ করে এসেছি। শিশুর কলহাস্য যেন আমাদের কণ্ঠে বেজে উঠেছে, তরুণের প্রাণচঞ্চলতা আমাদের চলার ছন্দে ছন্দে।

হরিদ্বারে গঙ্গার অবতরণ প্রথম সমভূমিতে। তাই আধ্যাত্মিক ভারতবাসীর নিকট তীর্থ হতেও বড়—মহাতীর্থ। শত সহস্র মুমুক্ষু সাধু মহাত্মার পদরেণুতে সুপবিত্র। তবু আমরা এখানে থামবার প্রয়োজন অনুভব করি না। আমাদের দৃষ্টি অনেক দূরে নিবদ্ধ। আমরা এগিয়ে চলি হৃষিকেশ অভিমুখে, হরিদ্বার থেকে আরও ১৫ মাইল দূরে। আমাদের বাসপথের যাত্রা শুরু সেখান থেকেই। সেখান থেকেই সংগ্রহ করতে হবে আমাদের হাঁটাপথের অবশ্য প্রয়োজনীয় মালবাহক ও অন্যান্য ব্যবস্থা। তাই অন্ততপক্ষে একটি দিন সেখানে আমাদের থামতেই হবে।

পরদিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমাদের বাসযাত্রা শুরু হোল। মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই হৃষিকেশকে আমরা আপন করে পেয়েছি। থেকেছি সাধু মহাত্মা কালীকম্বলীবাবার বিরাট ধর্মশালার একখানি ঘরে। হরিদ্বার, হৃষিকেশে যুগযুগান্তর কাল থেকে পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা। এখান থেকেই শুরু হ'ত তাদের পদযাত্রা। তীর্থের পথে পথে থাকবার স্থানাভাব, খাদ্যাভাব, তবু কোনদিন দুর্গমপথে তীর্থযাত্রীর অভাব হয়নি, তীর্থযাত্রা বন্ধ হয়নি। কাল কম্বলধারী দয়ালু সাধুবাবা শীতের দেশে যাত্রীদের থাকবার দুর্দশা দেখে ভিক্ষা শুরু করলেন। প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করে স্থাপন করলেন অগণ্য ধর্মশালা তীর্থে পথে পথে। এমনি অনেকগুলি ধর্মশালা আছে কেদারনাথের পথে, আছে বদরীনারায়ণের পথে, আছে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথে। তার প্রধান কর্মকেন্দ্র হৃষিকেশে।

হৃষিকেশ থেকে বাস চলে কেদারনাথ, বদরীনারায়ণের পথে, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথে। কেদার-বদ্রীর যাত্রাপথ গঙ্গার উপত্যকা ধরে চলে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত। দেবপ্রয়াগ ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম। অলকানন্দার তীর ধরে এগিয়ে গেলে পৌছাই রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে কেদারনাথ ও বদরীনাথ যাবার দুটি

পথ আলাদা হয়ে যায়। অলকানন্দা উপত্যকা ধরে চলে বদরীনাথের যাত্রাপথ, মন্দাকিনীর উপত্যকা ধরে চলে কেদারনাথের যাত্রাপথ। রুদ্রপ্রয়াগ অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যেতে হলে হৃষিকেশ থেকেই ভিন্ন বাস ধরতে হয়। লছমনঝুলার কিছু পরেই একটি পথ টিহরীর দিকে গেছে, সেই পথে গেলে পাওয়া যায় ধরাসু। ধরাসু থেকে যমুনোত্রীর পথ আলাদা হয়ে গেছে। গঙ্গোত্রী যেতে হলে এগিয়ে যেতে হয় উত্তরকাশী অবধি।

চীন-ভারতের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে হিমালয়ের সীমান্ত অঞ্চলে যেতে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। আমরা পদযাত্রা শুরু করব গঙ্গোত্রী থেকে—উত্তরকাশী-জেলার অন্তর্গত, কিন্তু শেষ করব বদরীনারায়ণধামে—চমৌলী জেলাতে। এই দুটি জেলার সীমান্তে প্রবেশ করবার জন্য দুই জেলাশাসকের অনুমতির প্রয়োজন। তাই আমরা সর্বপ্রথম চলেছি চমৌলীর দিকে।

ভোরবেলা বদরীনারায়ণ যাবার বাসে চড়ে বসেছি। দুপুরে দেবপ্রয়াগ হয়ে সারাদিন বাসে চলে সন্ধ্যার কিছু আগে পৌছলাম রুদ্রপ্রয়াগে। দুপুরে দেবপ্রয়াগে খাওয়া সেরে নিতে হ'ল। পরের দিন সকালে বাস ধরে চমৌলী।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চমৌলী পৌছাতে তিন চার ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। দূরত্ব মোটে চল্লিশ মাইল। পাহাড়ীপথে বাস চলে অতি ধীরগতিতে, তাই সময়ও কিছু বেশী লাগে। চমৌলী এখন জেলা-শহর। তার বন্য সৌন্দর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করে শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল অনুমতিপত্র সংগ্রহ করবার। আমরা তাই সেদিনই দুপুরের বাস ধরে আবার রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে এলাম।

কুমায়ুনের এতগুলি প্রয়াগের মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগ আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে। ভালো লাগে উদ্দাম অলকানন্দার উচ্ছলতার মধ্যে আত্মসমর্পণ-রত ধীরগতিশীলা মন্দাকিনীকে দেখতে। সঙ্গম থেকেই সোজা উঠেছে ঘাটের সিঁড়িগুলি। আমাদের ভালো লাগে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা নির্জন ঘাটে বসে বসে সগর্জনে বয়ে চলা বিপরীত স্বভাবা নদী দুটির মিলন দেখতে। সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য না দেখলে কল্পনা করাও কঠিন, সেই তুহিন শীতল স্রোত-বেগে না নামলে বিশ্বাস করা চলে না, কি আকর্ষণে আমরা ফিরে ফিরে আসি ওই সঙ্গম-তীর্থে।

# উত্তরকাশী-গঙ্গোত্রী

পরদিন প্রত্যুষের বাস ধরে আমরা সোজা উত্তরকাশীর দিকে যাবো। দুপুরে শ্রীনগরে বাস বদল করে চলেছি তাই উত্তরকাশীর পথে। শ্রীনগরের দুই মাইল নীচে আছে নতুন তৈরী কীর্তিনগর ব্রীজ—ঝোলান ব্রীজ। বাস চলাচল করে ওই ব্রীজেরই ওপর দিয়ে। এতক্ষণ আমাদের পথ ছিল অলকানন্দার উপত্যকার মধ্য দিয়ে। এখন ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুতে উঠে চলেছি। একেবারে চূড়া পেরিয়ে আবার তেমনি এঁকে বেঁকে নেমে এলাম ভাগীরথীর উপত্যকাতে। পুণ্যতোয়া অলকানন্দা দূরে সরে গেল. বাস চললো ভাগীরথীর উপত্যকা ধরে ধরাসু পেরিয়ে উত্তরকাশীর পথে। সমুদ্রতল থেকে উত্তরকাশীর উচ্চতা ৩৮০০ ফুট।

উত্তরাখণ্ডে এইখানে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হয়ে বয়ে চলেছে। বারাণসী ছাড়া আর কোথাও এমনটি হয়নি। তাই উত্তরাখণ্ডের কাশী বলা হয় এই উত্তরকাশীকে। বারাণসীধামের মত এখানেও আছে দুটি নদী। উত্তরকাশী পৌঁছানোর কিছু আগে আছে বরুণা নদী, এসে মিশেছে ভাগীরথীতে আর দুমাইল পরে আছে অসি নদী। অসির উৎপত্তি হয়েছে ডোরীতাল হ্রদ থেকে। এই হ্রদটি ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত সৌন্দর্যময় গ্লেসিয়াল হ্রদ। পরিধি দুই মাইল মত হবে, সৌন্দর্যে নৈনীতালকেও হার মানায়। এই দুটি নদী বরুণা ও অসির জন্য উত্তরকাশী হয়েছে উত্তরাখণ্ডের বারাণসী—উত্তরাখণ্ডের মহাতীর্থ।

পুরাণে বলে, বিশ্বনাথ কলিযুগে বারাণসী থেকে এসে উত্তরাখণ্ডের এই কাশীতে অধিষ্ঠিত হবেন। কলিতে বারাণসী অধার্মিকে ভরে গেলেই এই ব্যবস্থা। শোনা যায়, এখানেই মহাভারত বিখ্যাত কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণে এই স্থানের নাম দেওয়া ছিল বারণাবত। এখানে দুর্যোধন পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহে দাহ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন।

উত্তরকাশীতে চারটি বিখ্যাত মন্দির আছে। বিশ্বনাথের মন্দির, শক্তির মন্দির, পরশুরামের মন্দির ও ভৈরবের মন্দির। শক্তির মন্দিরের বিখ্যাত ত্রিশূল এক নেপাল রাজপুত্র নির্মাণ করেছিলেন। পরে জয়পুরের মহারাজা সেই-স্থানেই একাদশ রুদ্রের মন্দির স্থাপন করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ( ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ) নানা ফার্নবিস এখানে এসে নির্বাসনে শেষ জীবন যাপন করেন বলে শোনা যায়। তিনি যে গৃহে বাস করতেন সেই গৃহ এখন রাজ্য সরকার যত্ন সহকারে রক্ষা করছেন।

মকর-সংক্রান্তিতে উত্তরকাশীতে সাতদিন ধরে বিরাট মাঘমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী ঐ সময় মেলা উপলক্ষ্যে উত্তরকাশী আসেন। এখানকার ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে অবগাহন তীর্থযাত্রীদের প্রধান আকর্ষণ।

উত্তরকাশীতে তীর্থযাত্রীদের থাকবার স্থানাভাব নেই। আছে পুরাতন কালীকমলী ধর্মশালা, আছে নতুন তৈরী বিড়লা ধর্মশালা।

উত্তরকাশী পৌঁছে শুনি, এবার এখান থেকে ১৮ মাইল দূরে ভাটোয়ারী পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করছে। আর চেষ্টা করলে ভাটোয়ারীতে জিপ পাওয়া যাবে—তবে আরও নয় মাইল এগিয়ে গংনানী যেতে পারি। গংনানী পর্যন্ত পথ তৈরী হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে ব্রীজ তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ না হওয়াতে গংনানী অবধি বাস চলাচল করতে পারছে না।

আমাদের উত্তরকাশীতে থামবার প্রয়োজন আছে। সীমান্ত প্রবেশ করবার অনুমতিপত্র নিতে হবে। গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাত্রীদের সকলকেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে।

যথারীতি পুলিশ-ফাঁড়ি, কোর্ট, কাছারি ইত্যাদি সেরে আমরা দুপুরের বাসে রওনা হলাম। ভাটোয়ারী যেতে দুঘণ্টারও কম সময় লাগে—মোটে আঠারো মাইল পথ। ভাটোয়ারী পৌঁছেই দাদা শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি গেলেন জীপের খোঁজে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে জীপও পাওয়া গেল, আমরা তাতে করে গংনানী পৌঁছলাম। মালপত্র সহ কুলিদের আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাবশ্যক মাল কেবল আমাদের সঙ্গে রইল।

গংনানীতেও আছে থাকবার জন্য কালীকমলীবাবার ধর্মশালা। সেখানেই স্থান পেলাম। গংনানী ছোট জায়গা। কয়েকটি দোকানঘর ও বাড়ি ছাড়া

উল্লেখযোগ্য কেবল আছে আধমাইল দূরের একটি উষ্ণজলের কুণ্ড—নাম ঋষিকুণ্ড।

পরের দিন দশমাইল পথচলা। প্রথম হাঁটা-পথের শুরু আমাদের। প্রথম আট মাইল মোটামুটি সহজ সরল, শেষ দুই মাইল চড়াই। কঠিন চড়াই। কিন্তু গোটা পথটি বড় সুন্দর। ভাগীরথীর তীর ধরে ধরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ এঁকে বেঁকে গেছে। কি অপূর্ব রূপ ভাগীরথীর! কোথাও উদ্দাম উচ্ছল হয়ে চলেছে যেন কোন বাধা মানবে না সে কিছুতেই, পরক্ষণেই দেখি শান্ত স্থির জলধারা ধীর গতিতে বয়ে চলেছে, মনে হয়, কোন জলাশয়ের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। তীরের বালুময় বেলাভূমির উপর পাখীর মেলা বসে গেছে। কোথাও কোথাও বিরাট বিরাট পাথর জলের মধ্যে মাথা জাগিয়ে রয়েছে, গতিশীল জলধারা ফেনায়িত হয়ে উঠছে সেই পাথরে বাধা পেয়ে। দুই তীরের পর্বতমালা থেকে অগণ্য ঝরনা নেমে এসে ভাগীরথীতে মিশেছে, তাদেরই বা রূপ কি! নৃত্যপরা চটুল মেয়ে যেন শুভ্র নীলাভ অঞ্চল উড়িয়ে নেচে চলেছে। উপলময় তাদের গতিপথ, তাই চলনে উচ্ছলতা।

সুখী-চটির শেষ দুই মাইল ভাগীরথীর নদী-বক্ষ ছেড়ে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে হয়। সুখী যেতে তাই বড় দুঃখী হতে হল। সুখীর উচ্চতা ৮,৭০০ ফুট। এখানেও আছে কালীকম্লী ধর্মশালা আর গুটিকয়েক দোকান-ঘর, ধর্মশালার চারপাশ ঘিরে। সুখীর তিন মাইল পর আছে "ঝালা" চটি, কিন্তু সেখানে স্থানাভাব হবে, তাই ইচ্ছে থাকলেও আমরা আজ আর এগোবার চেষ্টা করি না।

ঝালার পর আধমাইল নীচে নামলে পথে পড়ে শ্যামপ্রয়াগ। শ্যামগঙ্গা এসে মিশেছে ভাগীরথীতে। এখান থেকে ভাগীরথীর রূপ অপূর্ব-সুন্দর। কে বলবে এই ভাগীরথীরই এমন উদ্দাম রূপ একটু আগেই দেখে এলাম। বিশাল চওড়া একটি উপত্যকার মধ্য দিয়ে ভাগীরথী অনেকগুলি ধারাতে বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। গতি আছে, নেই চঞ্চলতা। একেবারে ভিন্নরূপ! হরশিল বা হরিপ্রয়াগ সুখী থেকে ছয় মাইল দূরে। হরশিলকে বলা হয় মর্ত্যের বৈকুণ্ঠ। কিন্তু হরশিলের ছবি দেখে যদি কেউ সুইজারল্যাণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপ বলে ভুল করেন, আমরা দোষ দেব না, এমনি পাইন-ফার-দেওদারের

সমারোহ। এখানে বেশ বড় একটি আপেলের বাগান তৈরী করা আছে হরশিলের উচ্চতা ৮,০০০ ফুট।

হরশিলের পথে চলতে চলতে মনে হয় না যে আমরা দুর্গম পার্বত্যপথে চলেছি। সমতলভূমি। এখানে এসে মিশেছে তিব্বতের নেলাং গিরিবর্ত্মের পথ। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য চলে এই পথে। এই পথ ধরেই চলতো কৈলাশ ও মানস-সরোবরের তীর্থযাত্রা। এখনো এখানে দেখা যায় বহু তিব্বতীকে, যাঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। তাঁদের তৈরী তিব্বতী বৌদ্ধমন্দির—বগোরীতে। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে এখন। কিন্তু এখনো এখানে দেখা যায় তিব্বতীরা ভেড়ার উল থেকে তৈরী করছে মোটা গরম কম্বল—নিজেদের তাঁতে বোনা। তিব্বতী ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের সঙ্গে যে ভাষাতে কথা বলছে, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তারা ভারতে থেকেও যেন অন্য একটি সমাজ গড়ে রেখেছে সেখানে।

কিন্তু হরশিলে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল একটি দরজীকে দেখে। এক শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত শিখ বসে বসে পা-কল চালিয়ে জামা তৈরী করছেন—ইনি পাঞ্জাবী ব্রেফ্যুউজি। এতদূরে এঁকে দেখে আমাদের মনে সত্যি বিস্ময় জেগে উঠেছিল।

হরশিলের পর পথ ভাগীরথীর উপর ব্রীজ পার হয়ে ওপারে চলে গেছে ধরালী পর্যন্ত। শান্ত, নিস্তব্ধ বনভূমি—পাইন-ফার-দেওদার-শোভিত অঞ্চল। পথ চলেছে তারই মধ্য দিয়ে ছায়ায় ছায়ায়। চড়াই বা উৎরাই বিশেষ নেই, তাই চলাতে আনন্দ আছে, দুঃখ নেই। চলতে চলতে পথে কোন বড় পাথর পেয়ে যদি বসে পড়া যায়, তবে চোখে পড়ে বন্দরপুছ্ শৃঙ্গের তুষার-সৌন্দর্য। আমরা তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। শ্রীকণ্ঠ-চূড়ার নীচে, ভাগীরথীর তীরে ধরালী ছোট একটি সুন্দর গ্রাম। ক্ষীরগঙ্গা শ্রীকণ্ঠ থেকে নেমে এসে এখানে ভাগীরথীতে মিশেছে।

হরশিল থেকে নদী পার না হয়ে যদি পাহাড়ী-পথে সোজা চলে যাই, তবে পাই দুই মাইল দূরে মুখোবা গাঁও। এই গ্রামে গঙ্গোত্রী-মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডারা শীতকালে বাস করেন। তীর্থযাত্রার সময় গঙ্গোত্রী কয়েকমাস মাত্র লোকজন দোকানপাঠে সরগরম থাকে। শীত পড়া শুরু হতেই দুই-চারজন সাধু বাদে সকলেই নীচে মুখোবা গ্রামে বা উত্তরকাশীতে নেবে আসেন শীতকালে গঙ্গোত্রীতে প্রচুর তুষারপাত হয়।

ধরালীতে একটি প্রাচীন বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল। একবার পাহাড়ে ধস নেমে মন্দির ভাগীরথীর গর্ভে চলে আসে। মন্দিরের প্রায় সবটাই এখন নদীর বালুরাশির মধ্যে ডুবে গেছে, কেবল চূড়ার দিকে খানিকটা জেগে আছে।

ধরালীতেও আছে বিরাট ধর্মশালা, কালীকম্‌লীবাবার তৈরী। সেখানে থাকতে যাত্রীদের কোন অসুবিধা নেই। আমাদেরও আশ্রয় মিললো সেখানেই। ধরালী থেকে জঙ্গলচটি (৮,৬০০ ফুট) মাত্র চার মাইল দূরে। পথ সমতল। এখানে নদীর উপরের একটি ব্রীজ পার হলেই দেখা যায় নেলাং পাস্‌ হয়ে তিব্বতের কৈলাশ-মানস-সরোবরের পথ। জংগলচটির পর আরও আড়াই মাইল চড়াই অতিক্রম করে পাওয়া গেল ভৈরবঘাঁটি। পথে পড়ে জাহ্নবী-সঙ্গম। নীলাঙ্গ জাহ্নবী বা জাঠগঙ্গা নেলাং পাস্‌ থেকে এসে মিশেছে ভাগীরথীতে। মহাভারতের জহ্নুমুণির উপাখ্যান এখানেই প্রাণ পেয়েছে।

হরশীলের ভাগীরথী এখন আর সমতলে বইছে না, কঠিন পাহাড়ের দেয়াল ভেদ করে অগ্রসর হতে হয়েছে তাকে, তাই আমরা চলার পথে কেবল গুঞ্জন শুনতে পাই, বহু চেষ্টা করলে কোন কোন স্থান থেকে অনেক নীচে পাহাড়ের গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে যেতে একটুখানি দেখাও যায়।

ভৈরবঘাঁটির উচ্চতা নয় হাজার ফুট। এখানে পৌছাতে একটি কঠিন চড়াই পার হতে হয়। তীর্থযাত্রীর মনোবল যাচাই হয়ে যায়। ভৈরবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে আকাশ-ছোঁয়া ঘন পাইনবনের মধ্যে। শিবভূমির দ্বাররক্ষক ভৈরব তাঁর অনুচরবৃন্দ নিয়ে আগলে রেখেছেন গঙ্গোত্রীর দ্বার। ভৈরবঘাঁটি পার হতে পারলেই যেন ছাড়পত্র মিললো গঙ্গোত্রী প্রবেশের। তাই ভৈরবঘাঁটি পৌছালেই মনে হয়, এখানে আর শুধু শুধু অপেক্ষা করা কেন, গঙ্গোত্রী আর দূরে নয়! এখান থেকে গঙ্গোত্রী মাত্র পৌনে সাত মাইল দূরে। মন তাই টেঁকে না, ভৈরবঘাঁটি ছাড়বার জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠি। কোন-রকমে রান্নাখাওয়ার পাট চুকিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব গঙ্গোত্রীর পথ ধরি।

গঙ্গোত্রী পৌছাতে বেলা শেষ হয়ে আসে, কিন্তু মনে আসে নিবিড় প্রশান্তি। আমাদের যাত্রার প্রাথমিক পর্যায় শেষ হোলো।

* * *

আমরা এসে পৌছেছি বৃহৎ হিমালয় অঞ্চলে। কুমায়ুনের এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গাবলী-শোভিত পর্বতমালা শতদ্রু নদীর চিনি উপত্যকা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে চলে গেছে। সারি সারি তুষার-শিখর—গঙ্গোত্রী হিমবাহের শুরুতে শতপন্থ ( ২৩,২১৩ ফুট ), চৌখাম্বা ( ২৩,৪২০ ফুট ) থেকে ক্রমান্বয়ে নন্দাদেবী ( ২৫,৬৪৫ ফুট ), নন্দাকোট ( ২২,৫১০ ফুট ) ও পঞ্চচুল্লী ( ২২,৬৫০ ফুট ) শিখর নেপাল-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই শৃঙ্গাবলীর দক্ষিণে আরেকটি অপেক্ষাকৃত নীচু পর্বতমালা আছে। নিম্ন হিমালয়ের ( Lesser-Himalayas ) ধৌলীধর পর্বতমালা এগিয়ে গিয়েছে এই দিকেই। এই পর্বতমালাতে আছে, বন্দরপুছ্ ( ২০,৭২০ ফুট ), একেই ভেদ করে হরশিলের নিকট ভাগীরথী বের হয়েছে; গঙ্গোত্রীর পর্বতমালাসমূহ, থালাসাগর ( ২২,৬৫০ ফুট ) ও কেদারনাথ শৃঙ্গ ( ২২,৭৭০ ফুট ); সবগুলি ভাগীরথী ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণে অবস্থিত। এই পর্বতমালা আরও কিছুটা এগিয়ে গঙ্গোত্রী-হিমবাহের শুরুতে অবস্থিত চৌখাম্বা পর্বতের সহিত যুক্ত হয়েছে। বৃহৎ হিমালয়ের উত্তরে আছে জাস্কার পর্বতমালা। এই পর্বতমালা তিব্বত ও ভারতের সীমান্ত বলে স্বীকৃত। তবে কখনো এই সীমান্ত এইজন্য জরিপ হয় নাই। এইদিকে তিব্বতের সীমানার কাছে আছে কতকগুলি উচ্চ শৈলশৃঙ্গ; অলকানন্দার উপনদী ধৌলী ও সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েছে যেখানে কামেট ( ২৫,৪৪৭ ফুট ), আবিগামিন ( ২৪,১৩০ ফুট ) ও মানা ( ২৩,৮৬০ ফুট ) শিখরের অবস্থান। মানার দক্ষিণে এই নদী দুইটির উপত্যকার মধ্যে আরও কয়েকটি শৃঙ্গ আছে, তার মধ্যে মন্দির-পর্বত (২১,৫২০ ফুট ), নীলগিরি পর্বত ( ২১,২৪০ ফুট ), রতবন ( ২০,২৩০ ফুট ), ঘোরী পর্বত ( ২২,০১০ ফুট ) এবং হাতি পর্বত ( ২২,০৭০ ফুট ) উল্লেখযোগ্য।

জাস্কার পর্বতমালা ও বৃহৎ-হিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল-সমূহের হিমবাহ থেকে সমস্ত জলভার ভাগীরথী এবং অলকানন্দার উপনদী দুটি ধৌলী ও সরস্বতী আহরণ করে। ভাগীরথীর জন্মও এই অঞ্চলে। ভাগীরথী বৃহৎ-হিমালয়ের ধৌলীধর পর্বতমালাকে ছেদ করে বের হয়েছে। অলকানন্দা সরস্বতী ও ধৌলীর জল নিয়ে বৃহৎ-হিমালয়ের মধ্য দিয়ে চৌখাম্বা পর্বত-শিখরাবলীর দক্ষিণ-পূর্বে যোশী মঠ ও চমোলীর মধ্যবর্তী একটি গভীর

পত্যকার খাত দিয়ে বয়ে গেছে। ভাগীরথী ও অলকানন্দা এই দুটি নদীর তীর ধরে ধরে তীর্থ পথ আছে। ভাগীরথীর তীর ধরে গেলে পাওয়া যাবে গোমুখ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষপ্রান্ত, আর অলকানন্দার তীর ধরে গেলে পৌছানো যাবে সরস্বতীর তীরে বদরীনাথ ধামে।

হরশিল থেকে ভাগীরথী ধরে এগিয়ে ধৌলীধর পর্বতমালার মধ্য দিয়ে গেলে নেলাং বা ছোটখাগা পাসে ( ১৬,৭০০ ফুট ) পৌছানো যায়। কিন্তু অধিক ব্যবহৃত 'পাস'-গুলি আছে সরস্বতী ও ধৌলী নদীর উৎপত্তি স্থানে; মানা পাস বা ডুংরিলা ( ১৮,৪০০ ফুট ) ও নীতি পাস ( ১৬,৬২৮ ফুট )। এই দুটি পথে তিব্বতে যাওয়া যায়। মানা পাস্‌টি পর্তুগীজ জেসুইটগণ ব্যবহার করতেন। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফাদার এণ্টনিও আঁদ্রাদে ও ব্রাদার ম্যানুয়েল মার্কুইস্ তাঁদের মিশনের কাজে শতদ্রুর উপর অবস্থিত তিব্বতে ছোট্ট একটি রাজ্য 'গোগে'-র রাজধানী 'সাপারাং' গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা দুই বৎসর পর প্রথম ক্রিশ্চিয়ান চার্চ নির্মাণ করেন। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪০ সালের মধ্যে অন্ততঃ বারজন মিশনারী ওই পথে যাতায়াত করেন।

ধৌলীধরের দক্ষিণের নিম্ন-হিমালয় ( Lesser Himalayas ) অগণ্য নদী-শোভিত পর্বতমালার জটিল রূপ। এই অঞ্চলেই আছে পার্বত্য-সহর সিমলা, চক্রাতা, মুসৌরী, ল্যান্সডাউন, রাণীক্ষেত, আলমোড়া ও নৈনীতাল।

উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিমালয়ের বিশেষ কিছু জানা ছিলো না। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন রবার্ট কোলব্রুক। ইনি আবিষ্কারের জন্য ভ্রমণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন, উৎসাহী ছিলেন। এই কাজের জন্য তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়তেন। এঁরই উৎসাহে শেষপর্যন্ত গঙ্গার উৎস জানা গেল। এই সময় কুমায়ুনের অধিকাংশ অঞ্চল নেপালের অধীনে ছিল, তারা নবাগতকে সেদেশে প্রবেশ করতে দিতো না। কোলব্রুক সাময়িকভাবে এই নিষেধ প্রত্যাহার করিয়ে নিজে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং তাঁর সহকর্মী ডবলিউ, এস, ওয়েব (of 10th Bengal N. I.) কে এই কাজের ভার দিলেন। ওয়েব এই কাজে আগেই যোগ দিয়েছিলেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েব কাজ শুরু করলেন, তাঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন এফ, ভি,

রেপার এবং একটি অত্যুৎসাহী মারাঠা যুবক নাম "হিয়ারসে"। ওঁরেব ভাগীরথীর উপরের দিকে "বরাহতে" (উত্তর কাশী)-তে ২০শে এপ্রিল পৌছলেন, কিন্তু ভাটোয়ারীর কিছু পরে 'রাইথল' পর্যন্ত এসে আর এগোতে পারলেন না। এই স্থান গঙ্গোত্রী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি ফিরে এসে ঐ নদীর উপত্যকা-পথ ধরে অলকানন্দা-সঙ্গম পর্যন্ত এলেন এবং অলকানন্দা-উপত্যকা ধরে বদ্রীনাথ পৌছালেন। তারপর তিনি যোশী মঠে (অলকানন্দা ও ধৌলীর সঙ্গমে) ফিরে এসে ধৌলীর তীর ধরে তপোবন পৌছালেন। কুঁয়ারী পাস্ অতিক্রম করে "পানা" হয়ে বিরেহী, নন্দাকিনী ও পরে পিণ্ডার-উপত্যকা ধরে আলমোড়া পৌছালেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে গুর্খাদের যখন কালী নদীর পশ্চিম তীরে হঠিয়ে দেওয়া হোল, তখন জে, এ, হজ্‌সন্ এই অঞ্চলে সার্ভেয়ারের পদাভিষিক্ত হয়ে আসেন। তিনি পর-বৎসর হারবার্ট-এর সহিত ভাগীরথীর উৎস গোমুখ পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

* * * *

এ পথের লোকালয়ের শেষ গঙ্গোত্রী, উচ্চতা (১০,৩১৯ ফুট), পথেরও তাই শেষ হোলো। গৃহত্যাগী চঞ্চল মন এখানে এসে যেন শান্তি লাভ করে। এখানের বৈশিষ্ট্য গঙ্গার মন্দির। উনবিংশ শতাব্দীতে নেপালের সেনাধ্যক্ষ অমর-সিং থাপা এই মন্দির স্থাপনা করেন। বর্তমান মন্দিরটি পুরাতন মন্দিরের উপর জয়পুরের মহারাজা নতুন করে নির্মাণ করে দিয়েছেন। মন্দিরের সম্মুখে একটু নীচের দিকে দেখা যায় একটি বিরাট শিলা—ভাগীরথশিলা নাম। সবাই দেখায় ওই শিলাসনের উপর আসন গ্রহণ করে রাজা ভগীরথ মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্ধারার্থ গঙ্গাকে আনয়নের জন্য বহুবর্ষ তপস্যা করেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগীরথের তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে হিমালয় কন্যা গঙ্গাকে মর্তে আনয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু এ-ও বললেন, স্বর্গ থেকে গঙ্গার পতনবেগ ধারণ করতে একমাত্র মহাদেবই সক্ষম। ভগীরথ পুনরায় তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে মহাদেব গঙ্গাকে ধারণ করতে সম্মত হন। কিন্তু গঙ্গা মহাদেবের মস্তকে পড়ে তাঁকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চান, মহাদেব বুঝতে পেরে তাঁকে তাঁর জটাজালে আবদ্ধ করে রাখলেন। পুনরায় ভগীরথের তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর জটামণ্ডল থেকে গঙ্গাকে ধীরে

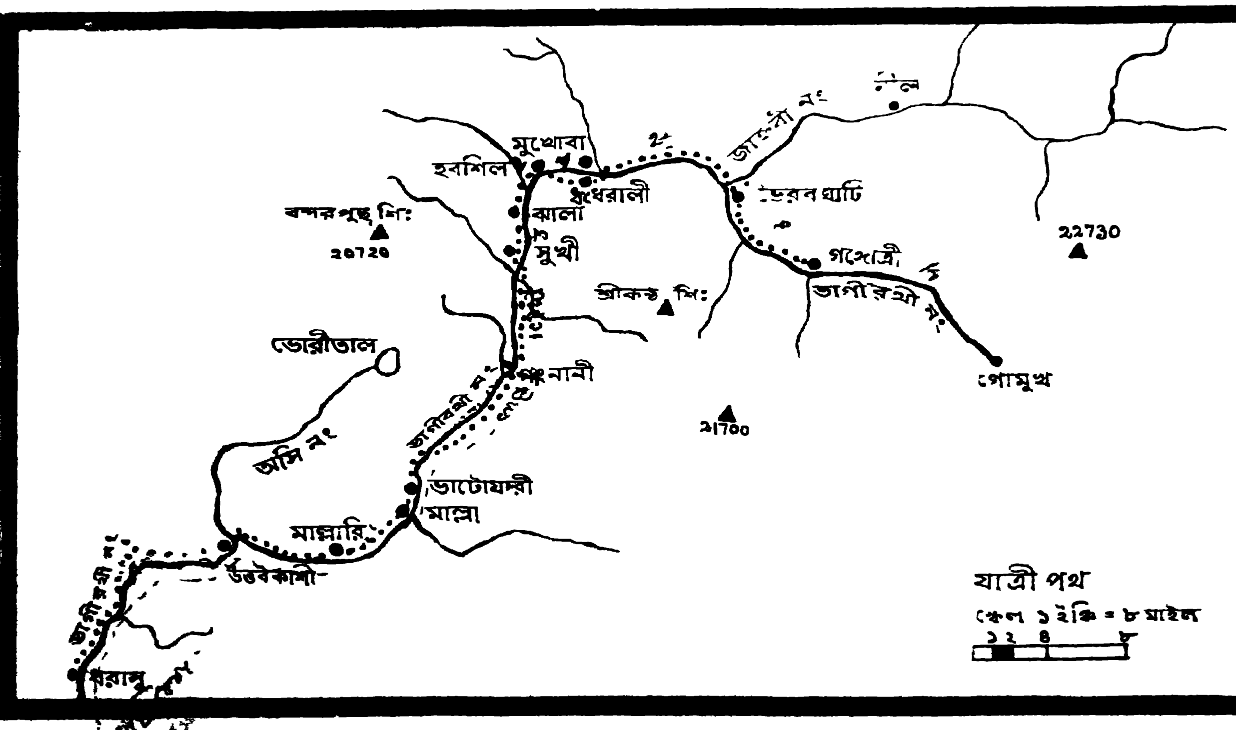
ধীরে মর্ত্যে নেমে আসতে দিলেন। গঙ্গা সপ্তধারায় ভূতলে অবতরণ করলেন। প্রধান প্রবাহ রাজা ভগীরথকে অনুসরণ করে চললো। শত শত গ্রাম, নগর, পার হয়ে শেষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রমে ভস্মীভূত ভগীরথের পূর্বপুরুষগণ গঙ্গা-সলিল-স্পর্শে মুক্তিলাভ করলেন। রাজা ভগীরথের নামানুসারে গঙ্গার অন্য নামকরণ হোল ভাগীরথী।

পুরাণের কথিত উপাখ্যানের সঙ্গে এখানকার ভাগীরথীর স্রোতধারায় মিল দেখতে পেলাম। দেখে মনে হ'ল যেন ভাগীরথীর উদ্দাম স্রোতধারা ব্রহ্মকুণ্ডে যেন কোন্ এক মহাস্থপতি গেরুয়া রঙের বাঁধ দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। সদ্যোমুক্তির আনন্দে উচ্ছলা ভাগীরথী,—তাঁকে যে শান্ত রাখতে হবে নইলে ভেসে যাবে পৃথিবী, ধ্বংস হবে সৃষ্টি। ব্রহ্মকুণ্ডের বাঁধ আধুনিক যুগের যে কোন বাঁধের সঙ্গে তুলনীয়। এই বাঁধের পরও আছে বিরাট বিরাট পাথরের দেয়ালের মত, যেন পাথরের তৈরী জটাজাল! ঐ গহ্বরের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন-ধারায় গঙ্গা বের হয়ে আসছেন—তীব্রবেগে ঐ ধারা আবার নামছে গৌরী-কুণ্ডে খণ্ড খণ্ড ভাবে, একটি শিবলিঙ্গের উপর। শিবের প্রস্তরময় জটায় আবদ্ধ ভাগীরথী গিরিমালার জটাজাল ভেদ করে পুনর্বার প্রকাশিত হচ্ছেন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, বহু বৎসর আগে গোমুখ গঙ্গোত্রীতেই অবস্থিত ছিল, গঙ্গোত্রী হিমবাহের অপসরণের জন্য এখন গোমুখ চৌদ্দ মাইল দূরে সরে গেছে।

কেদারনাথ পর্বত থেকে উদ্ভূত কেদার গঙ্গা এখানে এসে ভাগীরথীতে মিশেছে। এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী-অবধূত কুটির তৈরী করে বাস করছেন। ধর্মশালা আছে, তীর্থযাত্রীদের জন্যে। তাদেরই প্রয়োজনে সাময়িক দোকান পাঠ বসেছে। সাধুরা কেউ আছেন ডালপালা দিয়ে ছোট ছোট কুটির তৈয়ারী করে নিয়ে, কেউ বা আছেন গিরি-কন্দরে বাসোপযোগী ছোট বাসস্থান নির্বাচন করে নিয়ে। নির্জন-স্থান, ভাগীরথীর কলধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আওয়াজ নেই। নদীর দুই তীরের পাহাড়ে ছড়িয়ে ঢেকে আছে সুগন্ধি বন্য তুলসীর ঝোপের সহিত সুগন্ধি পুষ্প। পাইন বন মর্মরিত করে সুবাসিত বায়ু দেবমন্দিরের সুগন্ধে আমোদিত করে রেখেছে চারিদিক। ছোট ছোট ফুলভরা গাছ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে যেন দেবতার অর্চনার জন্যই সজ্জিত। দেবপূজার আয়োজন তেমনি যেন পাথরে পাথরে—পাহাড়ে পাহাড়ে করাই

রয়েছে। কোথাও দেখি যেন পাথরেই শঙ্খ-ডমরু আঁকা, কোথাও যেন বিশাল শঙ্খ প্রস্তরীভূত অবস্থাতে পড়ে আছে। সবাই দেখায়, ওই দেখ, রাজা ভগীরথের শঙ্খ, শিবের ডমরু।

আমাদের যাত্রার আয়োজনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু করতে হয়। স্বামী সুন্দরানন্দজীর সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করা, দিলীপ-সিং-এর সঙ্গে কথা বলে কুলি সংগ্রহ করা, খাবার, কেরোসিন, তাঁবু ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার। সব শেষ হলেও শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করা, তাই পাঁচদিন গঙ্গোত্রীতে থেকে সেস্থান পরিত্যাগ করি আমরা ১৭ই জুলাই '৬৩ সালের প্রত্যুষে গোমুখের উদ্দেশে।




গঙ্গোত্রী ও গোমুখ যাত্রাপথ

# গোমুখ

গোমুখ বা ভাগীরথীর উৎস আমাদের অপরিচিত নয়। দু'বছর আগে, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে, যমুনোত্তরী দেখে গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম। তখন হাঁটাপথ শুরু হয়েছিল উত্তরকাশী থেকে। বাসের রাস্তা উত্তরকাশীতেই শেষ। সবে উত্তবকাশী থেকে ভাটোয়ারী যাবার বাসের রাস্তা তৈরী হ'তে শুরু হয়েছে তখন। গঙ্গোত্রীই আমাদের যাত্রার শেষ সীমা ঠিক ছিল। একটানা পাহাড়ীপথে ছাপ্পান্ন মাইল চলে যখন গঙ্গোত্রী পৌছাই, তখন যাত্রাসমাপ্তির চিন্তা ক্লান্ত দেহে ও মনে বেশ কিছুটা শান্তি ও ভরসা এনে দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, যাত্রা শেষ হ'লো, এখন দুই একদিন বিশ্রাম করে উৎরাই পথে ফিরে যেতে ততটা কষ্ট হবে না।

কিন্তু দুই-একদিন বিশ্রাম করাতো দূরের কথা। গঙ্গোত্রীর সুপরিচিত স্বামী সুন্দরানন্দজীর প্রায় প্ররোচনায়ই বলা যেতে পারে, গঙ্গোত্রী পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হ'ল পরের দিন ভোরেই তাঁর নেতৃত্বে গোমুখে যাবো, যেখানে ভাগীরথী নদী হিমবাহের নীচে গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বামীজী বল্লেন, সাধারণতঃ বাঙ্গালী যাত্রীরাই গোমুখের কষ্টকর পথে চলার সাহস ও ধৈর্য্য রাখে।

স্বামীজীর সঙ্গে প্রসিদ্ধ গাইড দিলীপ সিং ও তার দুই বিশ্বস্ত সহচরও থাকবে। সুতরাং দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, এই ভরসা দিয়ে আমার স্বামীকে রাজী করলাম। তিনি পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত তাই গোমুখ যাত্রায় নারাজ ছিলেন। যথারীতি, পরের দিন ভোরে রওনা হই গোমুখের পথে। আসলে 'পথ' বলে কিছুই ছিল না। পাথরে পাথরে পা ফেলে চলা, কোথাও কোথাও ধসা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে বিপজ্জনক পথে চলা, কোথাও বা লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা অবস্থা বিশেষে কুলির পিঠে ঝরনার জল পার হয়ে পথ চলা। ভাগীরথীর বাঁ তীর ধরে ছিল সেবারের পথ।

এবারে চলেছি ভাগীরথীর ডান তীর ধ'রে ধ'রে, যে তীরে আছে গঙ্গোত্রীর মন্দির ধর্মশালা ইত্যাদি। গতবারের মত এবারেও আমাদের দলপতি হয়ে চলেছেন স্বামী সুন্দরানন্দজী, সঙ্গে সহকারী গাইড দিলীপ সিং ও তার মুখোবা গাঁও-এর দলবল। আমাদের দলে আছি আমরা চারজন, দাদা ( শ্রী উমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ), আমার স্বামী ও তাঁর বন্ধু মেজর সত্যেন বসু। এছাড়া আছেন একটি যুবক যাত্রী—পুণা থেকে এসেছেন। স্বামীজী পট্টবর্দ্ধনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাকেও সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। গঙ্গোত্রী থেকে আরও নয়জন সাধারণ যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। এঁরা গোমুখতীর্থ দেখে এবং তীর্থস্নান সেরে ফিরে আসবেন। বিরাট একটি দল সারি বেঁধে চলেছি।

পথে লোকালয় নেই, তাই পথও বিশেষ নেই। তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনে তৈরী পাহাড়ী পাকদণ্ডি আছে কেবল। তাও সর্বত্র নয়। পথ তৈরী করা সকলস্থানে সম্ভবও নয়। সে সব জায়গায় গতবারের মত পাথরে পাথরে পা ফেলে চলা বা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অতিকষ্টে পা রেখে এগিয়ে যাওয়া। দেয়ালের মত শক্ত পাহাড় কেটে কেটে পথ তৈরী হচ্ছে, এখনও সে কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে; তাই পাহাড়ের দেয়ালের দুদিকে মোটা কাছি ( দড়ি ) বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। পথ তৈরীর কাজে ব্যস্ত কুলি এবং আমাদের সঙ্গী পাহাড়ীদের সহায়তায় এই পথটুকু পার হওয়া, সেও বেশ বিপজ্জনক। বিশেষ করে যখন চোখে পড়ে, এই খাড়া দেয়ালের একশো ফুট নীচ দিয়ে স্রোতস্বতী ভাগীরথী সগর্জনে বয়ে চলেছে—তার তীর ও বুক সহস্র সহস্র প্রস্তরখণ্ড-পরিপূর্ণ! কোন রকমে হাত ফসকে বা পা পিছলে পড়ে গেলে একেবারে চূর্ণ হওয়া!

কোন কোন জায়গায় খাড়া চড়াই-এর ঝুরঝুরে বালিভরা গা বেয়ে পথ এঁকে বেঁকে গিয়েছে। চড়াই-পথ, তাই একটানা বেশীক্ষণ চলা যায়না। আবার পায়ের নীচের মাটি এমন ঝুরঝুরে যে থেমে দাঁড়ানোও চলে না। তবে কঠিন পথ এবার খুব কম। তাছাড়া ঝরনাগুলির উপর চলনসই গোছের কাঠের পোলও তৈরী হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে চলতে হলেও, এবারকার পথে একটানা ধসা পাহাড় কোথাও নেই।

পথে কোন ঘরবাড়ী নেই। কেবল দুই একজন সাধু-অবধূত কুটির তৈরী

ক'রে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। ভাগীরথীর বাঁ দিকের কূল ধরে চললে গঙ্গোত্রী থেকে নয়মাইল দূরে পৌছানো যায় চীরবাসা ধর্মশালায়। কোন এক পরাহিতব্রতী পুণ্যলোভী মহারাজা অনুগ্রহ করে এই প্রস্তরময় ধর্মশালাটি গোমুখ যাত্রীদের জন্য তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। দু'বছর আগে আমরা যথন গোমুখ দেখতে এসেছিলাম, বাঁ তীর ধরে এসে এই ধর্মশালায় যাতায়াতের রাস্তায় দুটি রাত্রে বাস করেছিলাম। গঙ্গোত্রী থেকে প্রথমদিন নয়মাইল গিয়ে চীরবাসাতে রাত্রে আশ্রয় নেওয়া, পরদিন প্রত্যুষে রওনা হয়ে পাঁচ মাইল দূরে গোমুখ দেখে স্নান সেরে আবার চিরবাসাতে ফেরা এবং সেখানে রাত্রিবাস।

কিন্তু এবার আর তা হবার উপায় নেই। এবার আমরা ভাগীরথীর ডান তীর ধরে চলেছি। তাই সেই ধর্মশালাতে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়নি। ধর্মশালাটী এবার নদীর অপর তীরে দেখতে পাই। চীরবাসার কিছু আগেই এপারে স্বামী সারদানন্দের আশ্রম। ভূর্জগাছের জঙ্গলের মধ্যে ভূর্জ গাছের ডাল ও বাকল দিয়ে তৈরী দুখানা ছোট ছোট কুটির। কুটিরের সম্মুখে পরিচ্ছন্ন একটি অঙ্গন। অঙ্গনের পরই খানিকটা সুসংস্কৃত জমিতে ফসল লাগানো। ছোট ছোট পাথর উপর উপর সাজিয়ে অনুচ্চ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জমিটুকু। একদিকে সুউচ্চ পাহাড, পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি গুহা। প্রয়োজন হলে গুহাগুলি রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহার করা চলে। হয়তো সাধুজীও কখনো কখনো ওখানে তাঁর আসন পাতেন।

স্বামী সারদানন্দজী আমাদের সঙ্গী হবেন, এই কথাই শুনেছিলাম, কিন্তু আমাদের সহযাত্রীদের মুখে তিনি খবর পেলেন, তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ শিবানন্দজী হৃষিকেশে অকস্মাৎ তিরোধান করেছেন, তিনি আমাদের সঙ্গ না নিয়ে, উলটো পথে ছুটলেন হৃষিকেশের দিকে। গুরুদেবের পারলৌকিক ক্রিয়াতে যোগ দিতে হবে তাঁকে।

আমরা রাত্রে সারদানন্দ স্বামীজীর অতিথি হয়ে রইলাম। দুই স্বামীজী মিলে আমাদের দলের সকলের জন্য রান্না করলেন। এই অঞ্চলে একপ্রকার বুনো টকগাছ জন্মায়, তারই রসালো নরম ডাঁটা দিয়ে টক ডাল, আর ভাত। একসাথে সকলকে বসিয়ে পরিবেশন করে খাওয়ালেনও তাঁরাই। সবাই খুব আনন্দ করে খেলাম।

ভূর্জগাছের তৈরী কুটিরে কোনমতে রাত কাটানো। পাহাড়ীদের

অধিকাংশই ভোজগাছের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিলো। শীতের দেশের লোক, তাই এখানকার শীতে ওরা কাতর হয় না।

গঙ্গোত্রী থেকে আমাদের সঙ্গে গোমুখ যাত্রী একজন পক্ককেশা বৃদ্ধা এসেছেন। তিনি রাত্রে পাহাড়ের গুহাতে শুতে গেলেন। মধ্যভারতের লোক, একাকিনী এই দুর্গম পথে এসেছেন। অদ্ভুত সাহস। সংসারের একাকীত্ব তাঁকে সাহসী করে তুলেছে। বলেন, আমার আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-পুলে কেউ নেই। কার মায়া করব? তীর্থ দর্শনে এসে যদি দেহপাত হয়, তবে সুখ বই দুঃখ কিসে? বনফুল ও বনতুলসী কোঁচড় ভরে সংগ্রহ করে এনেছেন। সারা বিকাল বসে বসে তাই দিয়ে বিনি সুতোর মালা গেঁথেছেন। আমাদের দুজনকে উপহার দিলেন। বলেন, আজ তোমাদের মধ্যেই আমি আমার লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা মালা পরো, আমি মনে করবো আমার ঠাকুরকেই আমি মালা পরালাম।

বেশ তো! মালা আমরা পরছি, বলি আমি। খুসী মনে দুজনে মালা দুটি পরেছি। কিন্তু সঙ্গী মেজর সাহেব তাতে হেসে উঠেছেন, ঠাট্টা শুরু করে দিয়েছেন।

পরদিন প্রাতে আবার চলা শুরু ক'রে বেলা আড়াইটা তিনটা নাগাদ পৌঁছেছি গোমুখের সম্মুখে। স্বামী সুন্দরানন্দজীর ইচ্ছে ছিল, আরও কিছু দূর এগিয়ে চ'লে আস্তানা নিই হিমবাহের উপর, যেখানে লাল প্রস্তরের আবরণ জড়িয়ে শুভ্র দেহখানি ঢেকে রাঙা করে 'রক্তবর্ণ' হিমবাহ এসে মিশেছে ধূসর 'গঙ্গোত্রী' হিমবাহে সেই সঙ্গমের কাছে। কিন্তু, আমাদের আর চলবার সামর্থ্য ছিলো না। বিশেষতঃ আমার স্বামীর হাঁটুর হাড়ে একটা যন্ত্রণা হওয়াতে তাঁর পক্ষে এগোন খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, বিশ্রাম নেওয়া তাঁর অতি প্রয়োজন হয়েছিল। অগত্যা গোমুখের তীরে পাহাড়ের গায়ে স্তূপাকার করা পাথরের উপর খানিকটা সমতল স্থান বেছে নিয়ে তাঁবু পড়লো।

## 'গঙ্গোত্রী'-হিমবাহ গোমুখ ও 'রক্তবর্ণ' হিমবাহ সঙ্গম

"মন্দাকিনী সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায়
নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায়
মন্দার-পুষ্প বহুপুষ্প-সুপূজিতায়
তস্মৈ ম-কারায় নমঃ শিবায়।"

ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি সুমিষ্টস্বর। কতো দূর থেকে যেন সঙ্গীত ভেসে আসছে। এ কার কণ্ঠস্বর? আত্মহারা কণ্ঠ স্তবগান গেয়েই চলেছে? আহা! কি মধুর সঙ্গীত!

ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো শিব স্তোত্রপাঠ, শুরু হ'ল নারায়ণ স্তব—"নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা—" গায়ক গেয়েই চলেছে। সম্মোহিত হয়ে আমরা শুনছি। ঘুমের ঘোর কেটে গেছে। স্বামী সুন্দরানন্দজী প্রত্যূষের পূজাপাঠে নিমগ্ন। আত্মহারা হয়ে সুললিত স্বরে গান গেয়ে চলেছেন, সে গান যেন আর শেষ হতে চায় না। অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছন্ন হয়ে শুনতে লাগলাম, কখন যেন তিনি তাঁর গুরুপ্রণাম শেষ করলেন, জানিনা। তাঁর কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে, কিন্তু সুরের রেশ আকাশে বাতাসে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরে ফিরতে লাগলো। আবিষ্ট মনে সুর বেজেই চলেছে—"মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায়—"

মন্দাকিনী-সলিল-স্নাত শিবরাজ্যে আস্তানা নিয়েছি, এসেছি পরম পবিত্র গোমুখ-তীর্থে। পাশেই বয়ে চলেছে ভাগীরথী। শিশু ভাগীরথী জন্ম নিয়েছে এখানে। ধরিত্রী তাঁর বক্ষ চিরে জন্ম দিয়েছেন পুণ্যসলিলার। হিমালয় পর্বতের উচ্চ-প্রদেশের দুর্গম প্রস্তর সমাকুল রাজ্য। প্রকৃতির কোমলতার চিহ্ন মাত্র নেই, কেবলই রুক্ষ পর্বত শ্রেণী।

আমাদের সম্মুখে 'গঙ্গোত্রী' হিমবাহের পশ্চিমপ্রান্তের তুষার-স্তূপ স্তরে স্তরে প্রসারিত রয়েছে, তারই নিম্ন দেশের প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে শিশু ভাগীরথীরউ জন্ম। মাঝে মাঝে গুম্ গুম্ শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠ্‌ছে, বিশাল তুষারস্তূপ

ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের অংশ প্রস্তর-খণ্ডসকল গড়িয়ে পড়ছে নীচে। কামানের গর্জনের মত তার পড়বার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে ক্ষীয়মাণ ঘননীল আকাশের কোলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিবেশের জন্ম নিয়ে শিশু ভাগীরথী কলহাস্যে নাচতে নাচতে চলেছে। উপল-সমাচ্ছন্ন পথের উপর দিয়ে তার গতিপথ। গোমুখের চিরান্ধকার গুহার মধ্য থেকে বন্দিনী মুক্তি পেয়ে যেন চমকে উঠেছে, ধীর হয়েছে তার গতি, পরমুহূর্তেই উচ্ছল হয়ে পরমানন্দে হেসে হেসে নেচে নেচে চলেছে।

ধরণীতে নেমে মাতৃরূপ ধারণ করবে সে,—কত নগর, কত শত জনপদ লালন করবে—কত ভূমি শ্যামল হয়ে উঠবে তার স্পর্শে। পতিতপাবনী সুরধুনী পতিতোদ্ধার করতে নীচে ছুটে চলেছে।

দিনের আলো এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমাদের ছোট্ট তাঁবুর মধ্যে বিছানা আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছি, কতো এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকাতে থাকে।

—"মনি, ওঠ, ওঠ, বাইরে বেরিয়ে দেখ, কি পরিষ্কার দেখাচ্ছে চারিদিক।"

—"ওরে মোনে, বেরিয়ে দেক্ দিকি নি একবার!"

দাদা ও মেজর সাহেব—উভয়ের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ডাকছেন আমার স্বামীকে। তিনিও জেগেছেন আগেই। শীতের জড়তা কাটিয়ে আমরা দুজনে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

দুরন্ত শীত। সমুদ্রতল থেকে এখানকার উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট। কুয়াশার হাল্কা আবরণে এখনো চারিদিকের পৃথিবী কিছুটা ঢাকা রয়েছে। প্রস্তরাচ্ছাদিত দুর্গম হিমরাজ্যের শুরু এখানে। তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে শুভ্র তুষারশৃঙ্গগুলি। সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন ভাগীরথী শৃঙ্গরাজি, পাশে মহিমময় শিবলিঙ্গ শিখর, তার পাশে ভৃগুশিখর। বাঁয়ে সুদর্শন শৃঙ্গ, পাহাড়ের আড়ালে পড়েছে। এদের সকলের পদতলে কলনাদিনী ভাগীরথী গোমুখের তুষারগহ্বর থেকে নিঃসৃত হয়ে আসছে। তুষার-শৃঙ্গগুলির উপর উজ্জ্বলতা এখনো সুপরিস্ফুট হয়নি। আবছা আলোতে নীলাভ ছায়া ঘেরা, কিছুটা কুয়াশার

হাল্‌কা চাদরে ঢাকা। হিমশীতল বায়ু-স্পর্শে শিহরণ জাগে দেহে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য!

স্তরে স্তরে হিমবাহের তুষারস্তূপ সম্মুখের আকাশ ছুঁয়ে উঁচুতে উঠে গেছে। শুভ্র তুষারের উপরিভাগ বালি ও পাথর ঢাকা। মধ্যে মধ্যে শুভ্র নীলাভ তুষারের বিরাট দেয়াল নীচের পাথর স্তূপ ভেদ করে উঠেছে,—তার গায়ে আলোর ঝিকিমিকি। চারিদিকের পাহাড় নিজেদের চূর্ণ করে ঢাকা দিতে চেয়েছে হিমবাহের তুষারের নগ্ন শুভ্র-রূপকে। গলিত তুষার স্রোতে বাহিত হিমবাহ থেকে খসে আসা বালি পাথরে একপাশে পাহাড় জমেছে (Terminal moraine)।

'সুদর্শন'-শৃঙ্গের পিছন থেকে সূর্য্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার আবরণ পাতলা হয়ে আসে। প্রথমেই অরুণালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শিবলিঙ্গ শিখর। যেন মহাযোগী দেবাদিদেব মহাদেব সর্বজগতের ঊর্ধ্বে। তাঁর আসনে স্থির ভাবে ধ্যানস্থ। পাশে 'ভাগীরথী' শিখর। যেন জগন্মাতা দেবাদিদেবের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে স্মিতহাস্য সহকারে তাঁর সন্তানদের অবলোকন করছেন। তাঁর নয়নের করুণারাশি বিগলিত ধারায় তাঁরই পদতল থেকে নেমে আসছে—পুণ্যতোয়া ভাগীরথী পতিতপাবনী ধরাতলে অবতীর্ণা হচ্ছেন।

দুই পাশে ভৃগুশিখর, সুদর্শন শিখর, হাসিতে জলজল করে ওঠে!

আমরা সকলে এক একটি পাথরে আসন নিয়ে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচনের দৃশ্য দেখি, আত্মহারা হয়ে নিঃশব্দে। সূর্য্যদেবের আলোকরাশি পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে এসে কখন যেন আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে!

স্বামীজীর কিন্তু এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের চলার পথের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। তাই তাঁর ব্যস্ততারও সীমা নেই, কাজেরও অন্ত নেই। ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। চা তৈরী হয়ে গেছে, তাঁবু গুটিয়ে এবার রওনা হতে হবে।

"জল্‌দি জল্‌দি তৈয়ার হো যাও বহিন্‌জী। আজ জরুর নন্দন বন পৌছানে হোগা। আজকা রাস্তা বহুৎ খতরনাক্‌ হ্যায়।" গাইড দিলীপসিং তাড়া লাগায়।

আজকের পথ যে খুবই খারাপ, চলা শুরু করেই একথা হাড়ে হাড়ে টের পাই। আমরা এবার গঙ্গোত্রী-হিমবাহের উপর উঠতে আরম্ভ করেছি।

হিমবাহের দুইপাশে পর্বতশ্রেণী, তারই গায়ে ছোট বড় অগুন্তি পাথর জমে, তারই উপর পা ফেলে ফেলে চলা। এ যেন অসম্ভব কঠিন বলে মনে হয়।

সঙ্গী পাহাড়ীরা সকলেই সাহায্য করবার জন্ত উন্মুখ, বিশেষ করে আমাদের পুরাতন সঙ্গী দিলীপ সিং ও হরচাঁদের তো কথাই নেই। এরা দুজনেই দু'বছর আগে আমাদের গোমুখ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিল, তাই তাদের মধ্যে আবার আমাদের পেয়ে ওরা ভারি খুসী হয়েছে। আমাদের উপর তাদের দাবীও তাই বেশী। দুর্গম পথের শুরু হতেই এরা আর সঙ্গ ছাড়ে না। হরচাঁদ মাল বইবার কুলি। পিঠে আধমণের উপর বোঝা নিয়েছে সে। তবু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বোঝাটি দূরে পাহাড়ের গায়ে নামিয়ে রেখে ফিরে এসে সে সহাস্ত মুখে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে—

"বহিন্‌জী! হামারি সাথ্ আও, হম্ ঠিক সে লে যায়েঙ্গে।"

কর্তব্য-কঠোর, পরিশ্রমী, সাহসী দিলীপের চতুর্দিকে নজর। বহিন্‌জীর তত্ত্ব করবার জন্ত হরচাঁদ-ভাই থাকলে আর ভাবনা কি! সে অন্য সকলের চলার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে পারে। এগিয়ে গিয়ে চলবার পথ দেখাতে পারে।

গঙ্গোত্রী-হিমবাহের উত্তর তীরের পাথর-স্তূপ Lateral moraine ধরে আমরা চলতে শুরু করেছি। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পাথরের পর পাথরে পা ফেলে চল্‌তে চল্‌তে স্বামীজীর নির্দ্দেশে আমরা থেমে পিছন পানে ফিরে তাকাই।

ফেলে আসা গোমুখের সম্মুখের পাথর-স্তূপের ( Terminal moraine ) আড়ালে পড়েছিল গোমুখ গহ্বর। আমরা তাই আগে দেখতে পাইনি—কেবল ভাগীরথীর কলধ্বনি শুনেছি সারারাত ধরে। এখন উঁচুতে উঠে স্পষ্ট নজরে পড়ছে সমস্তটা। বিশাল তুষার-স্তূপের তলার গহ্বর থেকে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হয়ে নিঃসৃত হয়ে আসছেন। সর্বপ্রথম শান্ত ধীর তার গতি, একটু পরেই উপলখণ্ডের সংঘাতে উচ্ছল উদ্দাম হয়েছে—সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে স্রোতধারা পশ্চিমমুখী হয়েছে।

গতবার যখন গোমুখ দেখতে আসি, ভাগীরথীর এমন আবির্ভাব আমরা দেখতে পাইনি। তার কারণ, সেবার মে মাসে এসেছিলাম। অনেক বরফ ছিলো তখন, গোমুখ গহ্বরের সম্মুখের বিশাল তুষার প্রাচীর

আমাদের দৃষ্টিরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পৌছান আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঐ দেয়ালের তলা দিয়ে উচ্ছল জলস্রোত নির্গত হয়ে আসতে দেখেছি। ঐ ছিল সেদিনকার "গোমুখ"—ভাগীরথীর প্রথম আবির্ভাব-স্থল !

পাহাড়ের উপর উঠে পর্বতগাত্র বেয়ে পূর্বদিকে এগোতে থাকি। শিবলিঙ্গ শিখরের পাশে অন্য একটি অপূর্ব রমণীয় তুষারশৃঙ্গ দেখা দেয় এখন। নাম তার "কীর্তি-স্তম্ভ।" যেন কোন মহাপুরুষের কীর্তি ঘোষণা করছে। প্রথম দর্শনেই কেন যেন "সাঁচী-স্তূপে"র কথা মনে পড়ে যায়। অপার্থিব আনন্দে মন ভরে ওঠে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ক্ষণিক দেখা দিয়েই, আবার কুয়াশার আবরণে সম্পূর্ণ ঢেকে যায় শিখরটি।

পাথরে পা ফেলে আমরা আরও এগিয়ে চলেছি। চলতে চলতে হিমবাহের অপরূপ রূপ আমাদের চোখের সামনে এগিয়ে আসে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাষায় বলি—

—"দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল। কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র-প্রভাবে সে গীত নীরব হইল। নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

সত্যই তাই! হুবহু এই বর্ণনার সঙ্গে মিল দেখলাম আজ। দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বিশাল একটি প্রস্তরময় ঢেউয়ের সাগর আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। কেবল ঢেউগুলি বিশাল এবং স্থির। কিন্তু স্থির হলেও এর রূপ সর্বদাই বদলাচ্ছে। রৌদ্রতাপে তুষার গলছে, জলস্রোত পাথর-স্তূপের নীচে দিয়ে তাই বয়ে যাচ্ছে, আর দুইপাশের পাহাড় থেকে সঙ্গে সঙ্গে বালি ও পাথর ক্রমাগত ঝরে ঝরে পড়ছে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে জমা হচ্ছে। হিমবাহের এমনি অবস্থাকে ভূবিদ্যায়

বলে, "Moraine". এদিকের পর্বতরাজ্যে চলবার পথ বলে কিছুই নেই। স্থিতিশীল কোন অবস্থা তৈরী হওয়া এখানে অসম্ভব। এই মুহূর্তে যে পথ তৈরী করে আমরা চলেছি, পাঁচ মিনিট পরেই হয়তো তা ভেঙে গেল, বা ধসে গেল। যে পাথরে পা রেখে নিশ্চিন্তে পার হলাম, পা তুলে নেবার পর সেটা গড়িয়ে বহু নীচে পড়ে গেল। বিরাট এক পরিবর্তনশীল পর্বত-রাজ্যে আমরা পৌছে গেছি। এই নতুন রাজ্যের বিশালত্বে এবং ভয়ঙ্করত্বে আমরা দিশাহারা হয়ে গিয়েছি। পথের দিক্-নির্দেশ করবার ভার নিয়েছেন স্বামীজী, নিয়েছেন দিলীপ সিং-জী। স্বচ্ছন্দগতিতে তাঁরা আমাদের সাথে সাথে চলেছেন। প্রয়োজনবোধে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করছেন।

সাধারণ চলবার যাত্রীপথেই চলতে আমরা অভ্যস্ত। পাহাড়ীও নই, পর্বতারোহীও নই। পাহাড়ীদের মত পাহাড়ের গায়ের পাথরে পাথরে লাফিয়ে চলবার অভ্যাস বা শিক্ষা কোনটাই আমাদের নেই। আর নেই পাহাড়ী নজর। পাথরগুলির চরিত্র চেনা ভারি কঠিন। কোন্‌টি স্থির, কোন্‌টি অস্থির তা কেবল অভিজ্ঞতার ফলেই জানা সম্ভব হয়।

সারি বেঁধে চলতে থাকি সকলে। একই দিকে, একই পাথরে পা দিয়ে চলেছি পর পর। চলতে চলতেই যেন পথ তৈরী হয়ে গেল, বিশ্রাম নেবার জন্য মাঝে মাঝে বসি, চারিদিকে ছড়ানো বড় বড় পাথরেরই উপর। পিছন ফিরে দেখছি, আমাদের তৈরী করা পায়ে চলা পথ প্রস্তর সাগরের তরঙ্গমালার মধ্যে হারিয়ে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখি, সেদিকেও এমনি প্রস্তরসাগর দিগন্তব্যাপী প্রসারিত হয়ে রয়েছে।

তবু নিরুৎসাহ হবার কথা মনেও আসে না। এই দুস্তর সাগর পার করবার কাণ্ডারী আমাদেরই সাথে রয়েছেন যে!

স্বামীজী লাফাতে লাফাতে চলেছেন; যেন বন্য হরিণ। তিনি দক্ষিণ ভারতের লোক, চলা দেখে কিন্তু মনে হয় পাহাড়ী হবার জন্যই তাঁর জন্ম, এমনি সহজ চলবার ভঙ্গী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের উত্তর তীর ঘেঁষে ধীরে ধীরে চলে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর স্বামীজী থেমেছেন। বিচিত্র হাসি খেলে যাচ্ছে তাঁর শ্মশ্রু-গুম্ফ শোভিত মুখের উপর।

"ওই দেখ, রক্তবর্ণ—হিমবাহ"—

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সম্মুখে দূরে বাঁদিকে রক্তবর্ণ প্রস্তরাচ্ছাদিত

এক হিমবাহ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এ পথের মানচিত্রটির কথা। ঠিকই তো! উত্তর দিক থেকে শ্বেতবরণ হিমবাহ নেমেছে। মিশেছে রক্তবর্ণ হিমবাহে, দুটি হিমবাহের একীভূত স্রোত আরও এগিয়ে এসে গঙ্গোত্রী হিমবাহে তাদের সব তুষার ঢেলে দিচ্ছে।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখছি, বহুদূরে উত্তর পূর্বদিকে যেন আকাশের গা ঘেঁসে হেলান দিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে শুভ্র তুষারশৃঙ্গরাজি। শৃঙ্গের শুভ্র তুষারের ছোট ছোট ধারা কালো কালো পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে শেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে রক্তবর্ণ প্রস্তর সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে। এই রক্তবর্ণ প্রস্তর ঢেউ আমাদেব দিকে এগিয়ে এসেছে—কাছে এসে আমাদের পায়ের নীচে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধূসর ঢেউয়ে মিলিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

এই অসীম পর্বতরাজ্যে কেমন যেন মুহ্যমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি। প্রকৃতির কি অপরূপ ভয়ঙ্কর রূপ! বোধশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে সকলের!

চলবার পথে পাথরের উপর বসে বসে বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে পিছনপানে তাকিয়ে দেখি। একই রূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য। গঙ্গোত্রী-হিমবাহের "প্রস্তরীভূত উর্মিমালা" বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। প্রান্তদেশে গোমুখের দিকে সারি সারি তুষার শৃঙ্গরাজি অচল, অমলিন সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাগীরথী পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ, শিবলিঙ্গ শিখর ও কীর্তিস্তম্ভ। শিবলিঙ্গ শিখর ও আমাদের মধ্যে কেবল একটি হিমবাহের ব্যবধান। হিমের রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে যেন এরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের অভয় দিচ্ছে।

এই "প্রস্তরাচ্ছাদিত স্ফটিকের সমুদ্রের" ঢেউ এর মধ্য দিয়ে আমরা বহুকষ্ট করে নিঃশব্দে চলতে থাকি। হঠাৎ গুম্-গুম্ শব্দে চমকে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে শুনি ঝর্-ঝর্-ঝর্-ঝর্ শব্দ! কি হোল আবার! থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি সকলে। আমাদের বিস্ময় ও আতঙ্ক দেখে হরচাঁদ হেসে উঠেছে। হেসে ওঠে দিলীপসিং ও স্বামীজীও। সামনে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাচ্ছেন—

"দেখো, পাহাড় টুট যা রহা হ্যায়, ঔর পথর ঔর বালি ভি গিরনে লাগা—ওই দেখো—"

তাকিয়ে দেখি—"থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে—

পাহাড় ভেঙে ভেঙে পাথর বালি পড়বার শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রৌদ্রতাপে তুষার গলছে, তুষারের উপরের জমা বালি-পাথরের স্তূপ ঝর্ ঝর্ করে পড়ছে। ক্রমাগত গ্লেসিয়ার ভাঙবার শব্দ শুনতে শুনতে চলেছি, কখনো সামনে ভাঙছে, কখনো পিছনে। প্রস্তরাচ্ছাদিত তুষারস্তূপের বিশাল ঢেউয়ের সারি, তাও স্থিতিশীল নয়, এ যে এক ভয়ানক রাজ্য। চারিদিকের শব্দে আমাদের বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। আমরা কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সম্মুখে দেখি, ওই যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে—

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।"

দিলীপ আগেই ইঙ্গিত করেছে। দূর থেকে দেখিয়ে বলেছে, ওই ওখানে বড় পাথরগুলির উপর আমরা থেমে বিশ্রাম করবো। এখন সম্মুখে তাকিয়ে দেখি—বহুদূরে রক্তবর্ণ হিমবাহের রক্তবর্ণ পাথর স্তূপের মধ্যে বিশাল একটি নীলাভ শুভ্র তুষার-গহ্বর: সেই তুষার-গহ্বরের ভিতর থেকে অপরূপ রূপের তরঙ্গ তুলে লীলায়িত ছন্দে নেমে আসছে একটি নীল স্বচ্ছ জলধারা। হিমবাহের রক্তবর্ণ ঢেউগুলিকে তার তরঙ্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে। নদীটির নাম "কালী-নদী।" আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণদিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধূসর তুষারস্তূপের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

এবার নদীটি পার হতে হবে, তাই দিলীপের ইঙ্গিতে হরচাঁদ এগিয়ে গেছে পথ খুঁজতে। আমরা বড় বড় পাথর বেছে নিয়ে তার উপর বসে বিশ্রাম করছি। অপূর্ব সৌন্দর্য পরিপূর্ণ অথচ ভয়ঙ্কর পরিবেশ। বিরাটের কি মহিমা! স্তব্ধ হয়ে আছি।

"দিলীপ সিংজী!" আমার ডাকে দিলীপ চমকে ওঠে। এমন সুন্দর রাজ্য, এমন অদ্ভুত সুন্দর দেশ, তুমি আমাদের এনে দেখাতে চাওনি কেন? আমরা এবার যখন দেশে ফিরবো, দেশের সবাইকে বলবো এখানকার কথা, আর তাদের এখানে পাঠিয়ে দেবো, তুমি তাদের সাথে করে এপথে নিয়ে আসবে—কেমন?"

অনুযোগের—অনুরোধের স্বরে বলছি দিলীপ সিংকে। কিন্তু এ কি বললাম? এক্ষুনি যে মনে মনে সঙ্কল্প করছিলাম, জীবনে আর কখনো কাউকে এই কঠিন

পথে আসতে বলবো না, আর নিজে তো আসবোই না! কিন্তু ঐ কি কথা বের হ'ল মুখ দিয়ে? স্থানমাহাত্ম্য বলবো কি?

শুনে কিন্তু দিলীপের মুখে ভাবান্তর বোঝা যায় না। মুখটি ঘুরিয়ে নেয় সে। কি জানি! বোধকরি ভাবছে, মাইজী এখনো কাবু হননি দেখছি!

অদ্ভুত দেশ! এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি এত সহজে, আবার বিশ্রাম করতে বসলে তেমনি সহজে ক্লান্তি দূর হয়।

সদা হাস্যময় হরচাঁদ এসে পৌছেছে আমার কথায় সায় দেয় সে, তার সাথে যোগ দেয় বীরসিং। হাসিমুখে বলে—

"বহুৎ আচ্ছা জায়গা,—লেকিন বহুৎ খতরনাক্ হ্যায়।"

এ অঞ্চলে দিলীপ সিং ও তার বড় ভাই গোবরসিং দুজনেই শ্রেষ্ঠ গাইড। সাতবার যাওয়া আসা করেছে, তবু সে এই কঠিন পথে আসতে রাজী হয় না। এমন বিপজ্জনক পথের "বর্ফে'র" কথা চিন্তা করলেও নাকি তার "বুখার' আ যাতা হায়!"

হরচাঁদ পথ দেখে এসেছে, তার নির্দ্দেশে আমরা সকলে কয়েকটা বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে হেঁটেই নদী পার হয়ে যাই, যেন প্রকৃতিরই তৈরী পাথরের সাঁকো, জলে নামতে হয় না। পেরিয়ে এখন আবার আগের মতই পাথরে পাথরে পা ফেলে এগোতে থাকি। একটু এগোতেই, আমাদের পাহাড়ী সঙ্গীদের মধ্যে হঠাৎ চঞ্চলতা অনুভব করে থেমে গিয়েছি। স্বামীজী শিস দিয়ে ইসারা করে এদের এগিয়ে যেতে আদেশ করেন; তিনি নিজেও দ্রুত এগিয়ে গেছেন। দূরে কুলিরা উত্তেজিত হয়ে নিজভাষায় কি যেন বলছে। আমাদের থামতে বলে হরচাঁদ ও দিলীপ এগিয়ে গেল।

উৎকণ্ঠাময় কয়েকটি মুহূর্ত্ত। হরচাঁদ এসে সংবাদ পরিবেশন করে—

"বাবুজী! যোধসিং গির্ গিয়া। বহুৎ চোট্ লাগা উস্‌কো। আপলোক ধীরে ধীরে চলিয়ে। হম্‌লোক উসকো দেখ্‌নে যাতা।"

ওরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে গেল। বেলা এগারোটা বেজেছে।

আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে আমাদের সকলের মুখ। স্বামীজী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে, নিজস্ব ধারাতে যোধসিং-এর চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন। আমরা ধীরে ধীরে চলে তাদের কাছে পৌছে দেখি, যোধসিংকে তার দেশের ভাইরা সবাই ঘিরে রেখেছে।

"জেয়াদা চোট্ নেহি লাগা, আভি ঠিক হো যায়েগা।" কিছুক্ষণ পরে সকলে মন্তব্য করে।

পথ চলবার সময় কখন যেন হার্ণিয়ার যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল যোধসিং-এর। তার উপর পিঠে তার আধমণ বোঝা। এই নিয়েই চলছিল সে। হঠাৎ স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে গেছে। আঘাত বিশেষ কিছু লাগেনি। পেটের যন্ত্রণাতেই সে কাতরাচ্ছিল। হিমবাহের উপর প্রস্তর-শয্যায় শুয়ে সে কেঁদেই চলেছে।

একটু দূরে দাদা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। শান্ত, ধীর, স্থির মানুষ। দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তবু সবচেয়ে শক্তিমান্।

চারিদিকে থরে থরে সাজানো পাথর ঢাকা তুষার-স্তূপের একপাশে এক একটি মস্ত পাথরে হেলান দিয়ে সকলে বসে আছি। কান পেতে অনুভব করছি, পাথরটার তলা দিয়ে কল্‌কল্ শব্দে জলধারা বয়ে চলেছে। তার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, চোখে দেখতে পাচ্ছি না। মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে গালাগালি বের হোল,

"দেখ হতভাগাদের কাণ্ড! আমরা চলতে পারি না, আর এরা এখানে পাথরের মধ্যে ঘরবাড়ি করে মাথা দোলাচ্ছে!"

"আরেঃ। এখানে আপনি কাকে গালাগালি করছেন? বিস্কুট আর চকোলেট বিলাতে বিলাতে মেজর সাহেব অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

"কেন? ওই ফুলগুলিকে? দেখুন না একবার! মাটি নেই, কিচ্ছু না, পাথরের ফাটলে ফাটলে গাছ কেবল নয় ফুল পর্যন্ত ফুটে আছে? যত্তো সব হতভাগা!"

হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠেছেন মেজর সাহেব—

"আচ্ছা ঝগড়াটে তো আপনি? শেষকালে ফুলের পেছনে লেগেছেন? কিন্তু, তাহলেও সত্যি কথাটি বলেছেন কিন্তু!" মাথা নেড়ে সায় দেন।

সত্যি! সমস্ত পথই এইরকম ফুল দেখতে দেখতে এসেছি। গোমুখের আগে ধসা পাহাড়ের গায়েও যেমন ফুটেছে, তেমনি ফুটেছে হিমবাহের ধারে জমা শুকনো বড় বড় পাথরের ( moraine ) ফাঁকে ফাঁকে। ছোট্ট ছোট্ট গাছে দুটি চারটি পাতা, দুটি চারটি ফুল—নানা রঙের বাহার। পাথরের কোনাগুলি যেন আলো করে রেখেছে। কিন্তু কষ্ট করে পথ চলবার সময় কে

বা ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছে! তবু এখন এখানে বসে বসে মনে পড়ছে, পথের সর্বত্র, সমস্ত সম্ভব অসম্ভব স্থানেই তারা এমনি আলো করে ফুটে ছিল। প্রকৃতির সাজসজ্জা করবার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, বিরাট রুদ্রের রাজ্যে কেমন যেন প্রহসন বলে মনে হচ্ছিল।

আমাদের সামনে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে হিমবাহের স্তূপের মধ্যখানের সবচেয়ে ঢালু— নীচু অংশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট স্রোতধারা। আশে-পাশের তুষার গলে গলে ছোট্ট ছোট্ট অনেকগুলি ধারা তির্ তির্ করে বয়ে এসে তার সাথে মিশ্ছে। একধারে তুষার গলা জল জমে ছোট্ট একটা পুকুর তৈরী হয়ে আছে। আকাশের নীলিমা যেন ধরা পড়েছে ওর ছোট্ট স্বচ্ছ বুকের আরসীতে।

স্বামীজী আমাদের জানিয়ে দিলেন, আজ এখানেই চা তৈরী হবে, নাস্তা খেয়ে আবার আমরা চলা শুরু করবো।

পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই। আমার স্বামী তাঁর নিজস্ব ধরনে বড় একটা পাথরে চিৎ হয়ে, অন্য পাথরে পা উঁচু করে রেখে শুয়ে আছেন। পথশ্রমের পর নাস্তা খেয়ে আরামে তাঁর চোখ বুজে এসেছে। কি জানি, হয়তো বা নাকও ডাকতে আরম্ভ করেছে! হঠাৎ কুলিরা "ডাক্তার সাব্", "ডাক্তার সাব্" চেঁচামেচি করে ডাকতে শুরু করেছে। উনি জেগে ধড়ফড় করে উঠে দেখেন, তাঁর পিঠের নিচে এবং পায়ের তলার ফাঁক দিয়ে ঝরনার জলস্রোত কল্‌কল্ করে বয়ে চলেছে! একটু আগে ফেলে দেওয়া চকোলেটের কাগজ ওঁর তলা দিয়ে ভেসে চলেছে! এই আধঘণ্টার মধ্যেই সূর্যতাপে অনবরত তুষার গলে গলে এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে ওঁকে ভাসিয়ে নেয় আর কি! চমকে জেগে উঠে তাড়াতাড়ি শুকনো ডাঙায় আশ্রয় নিয়েছেন।

স্বামীজী দেখে তো হেসেই কুটিকুটি। "কেয়া ডাক্‌টার সাব্, নিদ্ আয়া কেয়া"?

চা জলযোগান্তে ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু করেছি। পাথরের ঢেউ-এর একটার উপর পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উঠছি, আবার তেমনি কষ্ট করে নামছি। আমাদের পথ মোটের উপর চড়াই। খুব হাঁপিয়ে পড়েছি সবাই। কিন্তু স্বামীজীর নির্দেশ নড়চড় হবার উপায়

নেই। আজ নন্দনবন ( উচ্চতা ১৪,২৩০ ফুট ) যে করে হোক পৌঁছাতেই হবে।

"কোথায় নন্দনবন ? আর কতদূরে ?"

"উই দেখো, সফেদ পাহাড় দেখো, উস্‌কা পিছনমে, আউর থোরা যানেসে নন্দনবন পহুঁছ্‌ যায়গা। জেয়াদা দূর নেহি হ্যায়।" পাহাড়ীরা উৎসাহ দিয়ে বলে।

আপ্রাণ চেষ্টা করছি সকলে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে, কেবলই চলতে হবে এখন। পাথরের পর পাথর, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙোতে হবে। কিন্তু সহরের আরামে পরিপুষ্ট দেহ, বিশেষ করে শ্যামলা বাংলামায়ের সুখক্রোড়ে লালিত বঙ্গ-সন্তানের দেহ,—ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মনের একান্ত ইচ্ছা এগিয়ে চলবার, কিন্তু দেহ ক্রমাগত বাধা দিয়েই চলেছে।

দিলীপ এগিয়ে গিয়ে স্বামীজীকে বলে—এরা আর চলতে পারছে না, আজ এখানেই সুবিধামতন স্থান বেছে নিয়ে তাঁবু ফেলি। বেলা তো কম হয় নি।

কিন্তু স্বামীজী বড় কঠিন ঠাঁই। উঁহু, তা হবে না, যেমন করে হ'ক, নন্দনবন আজ পৌঁছাতেই হবে। সেখানেই আজ ক্যাম্প করব।

ধীর স্থির দিলীপ এবার একটু গরম হয়ে উঠেছে। বলে, এরা এখানে এসেছে বলে তো জান কবুল করে আসেনি! হ'লই বা দু'একদিন দেরী,—ধীরে ধীরে চলাই তো ভালো!

হরচাঁদ, জ্ঞানানন্দ সকলেই সায় দেয় তাতে। স্বামীজী রেগে ওঠেন—"এমনি করে চললে একমাসেও বদ্রীনারায়ণ পৌঁছাতে পারবে না এরা। তোমরা এখানেই থাকো, আমি আর পট্টবর্দ্ধন নন্দনবনে তাঁবু ফেলবো"

পট্টবর্দ্ধন কিন্তু হাঁটছে বেশ ভালো। যুবক ছেলে, শক্তিমান্‌, তার নিজের মাল সে নিজেই বয়ে এনেছে। স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। এদিকে আমরা চারটি অচল, ক্ষুধার্ত প্রাণী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি।

ইতিমধ্যে আমরা কখন যেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ ছেড়ে চতুরঙ্গী হিমবাহে এসে উঠেছি। তাই হিমবাহের পাথরে নানা রঙের সমাবেশ দেখছি! কিন্তু অবশ দেহ, বিবশ বোধশক্তি, কিছু দেখেও যেন দেখছি না, বুঝেও বুঝতে পারছি না! এই চতুরঙ্গী হিমবাহ পার হয়ে যেতে হবে নন্দনবনে! সামনে

বড় দুটি পাথরস্তূপের ঢেউ, যেন দুটি ছোট ছোট পাহাড়। তাই ডিঙোতে হবে এখনো। এদিকে বেলা পৌনে চারটা বেজেছে।

চতুরঙ্গী হিমবাহের উপর লাল-পাথরের মধ্যে একটি সমতল স্থান বেছে নিয়ে তাঁবু পড়লো। কাছেই ছোট্ট একটি স্বচ্ছ নীল জলাশয় (glacial lake)। হিমবাহের হিমগলা জলে পুষ্ট। পাহাড়ীরা আমাদের ঘিরে বসে সমবেদনার স্বরে আশ্বাস দেয়—চিন্তা কোর না, এখানে যা কিছু দরকার, আমরা সব তৈরী করে দেবো। চা, ভাত সব আমরাই বানাবো। আমরা থাকতে তোমাদের কোন কষ্ট পেতে দেবো না।

স্বামীজী আমাদের পরিত্যাগ করে পট্টবর্দ্ধনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমাদের অসামর্থ্যে আমরা লজ্জিত। মনমরা হয়ে তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম।

হরচাঁদ এসে ডাকাডাকি করছে,—বলে, Stove জ্বলছে না। কি করে চা বানাবো? রান্নাই বা হবে কি করে?

শুনি, দুটি প্রাইমাস্ ষ্টোভ্ সাথে ছিল, একটা স্বামীজী নিয়ে গেছেন—অন্যটি এরা জ্বালাতে পারছে না কিছুতেই।

মহাবিপদ, আজ কি তাহলে অভুক্ত থাকতে হবে?

হঠাৎ মনে পড়ে, আমাদের সাথে কতকগুলি solid fuel cakes আছে, যদি কখনো প্রয়োজন হয়, তাই সঙ্গে করে এনেছিলাম। শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়তে হয়—চা নইলে এখন কিছুতেই চলছে না! হরচাঁদকে বলি—ঠিক আছে, তুমি কেৎলিতে করে জল এনে দাও, আমি ফুটিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু বিধাতা বিরূপ! চারিদিকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। Fuel জ্বালানো যদি বা সম্ভব হয়, একটু জ্বলতে না জ্বলতেই দমকা হাওয়াতে বার বার নিভে যায়। আমাদের High-altitude Nylon tent-এর মধ্যে আগুন জ্বালাতেও সাহস হয় না। তাঁবুতে আগুন ধরে যেতে পারে; শেষকালে দিলীপ তাদের তাঁবুর মধ্যে ওগুলি জ্বালাতে নিয়ে গেল। দিলীপরা ওদের জন্য Canvass-এর তাঁবু এনেছে। তারই এককোণে আগুন জেলে চা তৈরী করে রান্নাও বসিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে আনা ডালপুরী দিয়ে চা খাওয়া হোল। রাতের জন্য খিচুড়ি ওই fuel জ্বালিয়েই ওরা করে ফেলেছে আচার সহযোগে মনে হয় যেন অমৃত খাচ্ছি।

# নন্দনবন-চতুরঙ্গী ও বাসুকি-হিমবাহ-সঙ্গম

২০শে জুলাই : ভোরে উঠেই চলবার তোড়জোড় শুরু করেছি। চা ও নাস্তা করে তাঁবু গুটিয়ে রওনা হয়েছি সকলে। আজ আমাদের সাথে স্বামীজী নেই। দিলীপ সিং সবাইকে হুকুম দিয়ে গোছগাছ শেষ করেছে। থেকে থেকে মনের মধ্যে একটা খোঁচা লাগছে। এতদূর থেকে এত চিঠি লেখালেখি করে স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে যাবার জন্য ব্যবস্থা করা, তার এই পরিণতি হ'ল? এত সহজেই তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারলেন? মনে হ'ল, সাধুরা বুঝি এমনিই হয়। সংসারের সব কিছু যিনি ছিন্নবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছেন—তাঁর কাছে আবার আসক্তি কিসের? কিসের বা মায়া? কিন্তু, আমরা যে শরণাগত! বিশেষ করে তাঁরই তত্ত্বাবধানে যাবার জন্যই আমাদের যে আগ্রহ ছিল?

নিঃশব্দে সকলে চলতে শুরু করেছি। মনে হয়, সকলের মন একই ভাবনার সূত্রে বাঁধা। অতঃপরম কিম্?

খুব শীত। তেমনি কন্‌কনে হাওয়া। চারিদিকের পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্যদেবের আলোটুকু আমাদের কাছে পৌঁছায়নি এখনো। কাল রাত্রে আমাদের তাঁবু পড়েছিল শিবলিঙ্গ পর্বতের ঠিক পায়ের তলায়। সারারাত অতন্দ্র প্রহরী পেয়েছি তাকে আমরা। কেবল চতুরঙ্গী হিমবাহ আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সূর্যালোক পড়েছে শিখরের উপর, এখান থেকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে শিখরটিকে। আমাদের নির্জীব মনে যেন আত্ম-প্রত্যয় এনে দিচ্ছে।

নন্দনবনে পৌঁছাতে আমাদের একঘণ্টার বেশী দেরি হোল না। চতুরঙ্গীর যে দুটি প্রস্তর ঢেউ পার হওয়া কাল আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল, আজ সে দুটি অতি সহজেই অতিক্রম করে আমরা নন্দনবনের ধারে পৌঁছে গেলাম। টিলার উপর থেকেই দেখছি, চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না,

ওইতো স্বামীজী আর পট্টবর্দ্ধন! স্বামীজী আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন! তীক্ষ্ণ শীষের আওয়াজও শুনতে পেলাম। স্বামীজী ডাকছেন আমাদের। তাহলে তিনি তো আমাদের পরিত্যাগ করেননি! আনন্দে আমাদের সবাইর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দূর থেকে ইসারা করে অগ্রসর হতে বলে স্বামীজী নিজেও চলতে শুরু করে দেন।

নন্দনবনে অবশেষে পৌছে গেলাম। অপরূপ সুন্দর উপত্যকাটির দৃশ্য। প্রায় দুই মাইল লম্বা এবং আধমাইল চওড়া একটি সৌন্দর্যময় সমভূমি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে চতুরঙ্গী হিমবাহের সমান্তরালে বিস্তৃত। ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গাছ, অজস্র ফুলে ভরা। কতো রঙের ফুলেরই বা বাহার! বড় কোন গাছ নেই, তাই ঘন বুনোন নানা রঙের ফুল আঁকা সবুজ কার্পেটের মত রঙের বাহার। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উপলাকীর্ণ পথে নেচে নেচে খিল খিল করে হাসতে হাসতে চলেছে একটি অপূর্ব রূপময়ী স্বচ্ছতোয়া নীল ঝরনা, নাম তার নন্দিনী—নন্দনবনের গরবিনী। হলদে গোলাপী, নীল ফুলগুলি গরবিনী নন্দিনীর উচ্ছল জলস্পর্শে হেসে হেসে উঠছে। পা ফেলতে সঙ্কোচ বোধ হয়, ফুলগুলিকে আঘাত না দিয়ে চলাও যে অসম্ভব! তাই পায়ের নজর দিতে দিতে চলি—ঝরনা ডাকে,—আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, নইলে আমি তোমার পথরোধ করে থাকব। তাইতো! থেমে দেখি, পায়ের সামনে সে যে তার নীলধারাটি বিভক্ত করে যেন হাত বাড়িয়ে গতিরোধ করছে।

হঠাৎ মনে পড়ে, তুষার শৃঙ্গগুলি কি হারিয়ে গেল? পিছন দিকে তাকাই। "না না, আমরাও আছি"—স্বর্য্যালোকে শুভ্রশৃঙ্গগুলি যেন হেসে উঠছে। শিবলিঙ্গ পিছনে পড়ে গেছে, কিন্তু দুই পাহাড়ের মাঝখানে সম্পূর্ণরূপে তুষারাবৃত কেদারনাথ-পর্বত সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেখা যাচ্ছে। এর আরেক রকম রূপ! ধব্‌ধবে তুষারের চাদর দিয়ে কে যেন পর্বতচূড়াটিকে ঢেকে দিয়েছে। বৃদ্ধ কেদারনাথ শুভ্র চাদর মুড়ি দিয়ে গাঢ় নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। আমাদের চলার পথের ডান দিকেও সারি সারি পর্বতমালা চলেছে, তাদের মাথায়ও যেন উজ্জ্বল হীরার মুকুট জ্বলজ্বল করছে। উনি আফশোষ করে বলছেন, কাল আমরা একটু কষ্ট করে এখানে এলেই ভাল করতাম। কি সুন্দর মনোরম জায়গাটি। এখানে একেবারে থাকাই হ'ল না।

গঙ্গোত্রীবাসের সময় আমাদের এপথে আসবার কথা শুনে ওখানকার একজন সাধু বলেছিলেন, আপনারা নন্দনবনে দুটি দিন থেকে চারিদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখবেন। নন্দনবন দেখে আনন্দ পাবেন। সাধুজী নিজে এপথে এসেছেন, তাই এপথের সকল সৌন্দর্য্যের খবর রাখতেন।

মনে মনে সবাই স্থির করেছি, আর স্বামী সুন্দরানন্দজীর নির্দেশ লঙ্ঘন করব না। ওঁর ইচ্ছে মত চললে যে কাল আমরাই লাভবান হতাম!

আজ হরচাঁদ আর আমাদের কাছে কাছে নেই। কঠিনতর পথ শুরু হয়েছে, সে জানে এখন মাল নিয়ে তাদের নিজেদের পক্ষে চলা কঠিন হবে। তাই আজ দিলীপসিং ও বীরসিং কেবল আমাদের সাথে সাথে চলছে। জলের বোতল, ক্যামেরা ইত্যাদি ছোট ছোট অত্যাবশ্যক মাল ওরা ওদের কাঁধে নিয়েছে। বলছে, বাবুজী আপনাদের এসব বইতে দেবো না। আমরা আপনাদের সাথে সাথেই থাকবো। যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন, আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

পথ চলতে চলতে দিলীপ গল্প জুড়ে দেয়, নন্দনবনে গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ভেড়া চরাতে ভেড়াওয়ালারা দলে দলে আসে। পাহাড় পর্বতে যেখানেই একটু চারণভূমি পাওয়া যায়, দুর্গম পথ অতিক্রম করেও তারা তাদের ভেড়া নিয়ে চরাতে আসে। এইসব দুর্গম জায়গায় তারা দিনের পর দিন বাস করে। এমনি আরেকটি চারণ ভূমি হ'ল "তপোবন।" ওই শিবলিঙ্গ শৃঙ্গের ওপিঠে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে এমনি আর একটি উপত্যকা আছে। আমরা যদি গঙ্গার ডান তীর ধরে না এসে বাঁ তীর ধরে আসতাম, তবে গোমুখের পরই তপোবনে পৌছে যেতাম। ওখানকার দৃশ্যও সুন্দর। শিবলিঙ্গ পর্বতের একেবারে পায়ের কাছে, চিরতুষারময় শিখরগুলি আরও কাছে মনে হয়। তপোবনে একটি সুন্দর লেক আছে। তাছাড়া ওখানে থাকবার ভালো জায়গা আছে, অনেকটা গুহার মতন। বিরাট একটি পাথর পাহাড়ের গায়ে এমন ভাবে বেরিয়ে আছে যে তার নীচে অনায়াসে দশ-বারোজন লোক থাকতে পারে, ঝড়বৃষ্টি হলেও কোন ভয় নেই।

গোমুখে আসবার পথে প্রায় মাইলখানেক আগে এমনি একটি ভেড়ার দলের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছিলাম। দুইপাশের সবুজ ও কালো মেশানো পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা দিয়ে ভাগীরথী বয়ে চলেছে, তার দুই তীর ঘন

ঘাসে ঢাকা। শীতকালে এই অঞ্চলের সমস্তটাই তুষারাবৃত থাকে। গ্রীষ্মের শুরু হতে তুষার গলতে শুরু করে, সাথে সাথে জন্মে ছোট ছোট ঝোপ ও শক্ত ঘাস। এইগুলিই ভেড়াদের খাদ্য। ভাগীরথীর তীরে কয়েকজন গ্রামবাসীকে দেখতে পেলাম, তারো আগুন জ্বালিয়ে বোধ করি রান্নার উদ্যোগ করছে। তাদের দু'শ' তিনশ' ভেড়া পাহাড়ের উঁচুতে চরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন কতকগুলি সাদা পাথর ছড়ানো। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেই পাথরগুলি জীবন্ত! ভেড়ার দল!

নন্দনবনে চলার পথের বাঁ দিকে রয়েছে চতুরঙ্গী হিমবাহ। আমরা নন্দনবনের উপত্যকার মধ্য দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে উঁচুতে উঠে হিমবাহের তীরের গিরিশিরা ধরে চলতে লাগলাম। দুই দিকে উচ্চ গিরিশ্রেণী এগিয়ে চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। মাঝখান দিয়ে সমান্তরালে চলেছে চতুরঙ্গী ও নন্দনবন। চতুরঙ্গী ও নন্দনবনের সীমারেখার গিরিশিরা ধরে আমাদের চলবার পথ। আমরা ডান দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছি, ফুলভরা সবুজ উপত্যকা, বাঁ দিকে দেখছি চতুরঙ্গীর বহুরঙা পাথরের স্তূপের সারি। কে যে নানারঙের পাথর সারি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে কে জানে! সেই সারিগুলি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর অবধি। কালো, ধূসর, মেটে, ইটের রং, লাল, হলুদ, সাদা··· কতো রঙের পাথরের সারের বাহার! চতুরঙ্গী নাম থেকে বোঝা যায় এতে আছে চারটি রঙের প্রাধান্য। মনে হয়, হলুদ, লাল, সাদা, কালো এই চারটি রঙই এখানে প্রধান। আমরা অবশ্য বলি চতুরঙ্গী শতরঙ্গী!

আশ্চর্য্য দেখতে! পাথরের নীচে রয়েছে হিমবাহের তুষার স্তূপ। কোথাও হিমবাহ চড়চড় করে পড়ছে—তার শব্দ চারিদিকের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে দূরে পাহাড়ের কোলে দিগন্তরেখাতে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও হিমবাহের খাদে তুষারগলা জল জমে পুকুর তৈরী হয়ে আছে। তার তীর নলাভ শুভ্র তুষারের তৈরী। পুকুরগুলির কোনটির রঙ দুধের মত, কোনটি সবুজ, কোনটি নীল। জলের মধ্যে টুকরো টুকরো বরফ ভাসছে। সূর্য্যালোক ঝিলিমিলি খেলে যাচ্ছে ঐ তুষারের খাঁজকাটা গায়ে গায়ে। অপূর্ব মোহময় পথ।

সহজ সরল পথ, বিপদ হবার কোন আশঙ্কা নেই তাই, সাহায্য করবারও

কোন প্রয়োজন নেই। তাই পাহাড়ীরা অনেক এগিয়ে গেছে। কেবল ক্যামেরা নিয়ে বীরসিং সাথে সাথে চলেছে।

আমরাও খুসীমনে হাসতে হাসতে গল্পগুজব করতে করতে চলেছি। উনি আজ কেবলই ছবি তুলে চলেছেন, বীরসিং তার হাতের তিনটে ক্যামেরা পর পর জুগিয়ে দিচ্ছে।

নন্দনবনের তুষার-পর্বত ঘেরা খোলা মাঠে তীব্র কন্‌কনে হাওয়া দিচ্ছে। আমরা আগেই আপাদমস্তক গরম পোশাকে আবৃত করে নিয়েছি। মাথায় বালাক্লাভা, হাতে গ্লাভস্, গায়ে পেঁয়াজের খোলার মত ছয় সাতটা গরম জামা, পায়ে গরম-মোজা ও হাণ্টার বুট।

নন্দনবন পার হয়ে চতুরঙ্গীর ধারে বেলা এগারোটা নাগাদ দিলীপ সিং ঘন ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে আসতে বলে চায়ের যোগাড় করতে শুরু করলো। স্বামীজী অনেকদূর এগিয়ে গেছেন, তাঁর নাগাল পাওয়া মুশকিল। আমরা ধীরে ধীরে চলেছি। তাই এই ব্যবস্থা। সুন্দর ঘনসবুজের মধ্যে পাথর ছড়ানো পাহাড়ের ঢালু গায়ে আমরা বিশ্রাম করবার জন্য বসে পড়েছি। আজকের পথ কষ্টকর নয়। তাই হাঁটতে আমাদের ভালোও লাগছে। মন আমাদের আনন্দে ছলছল করছে। বড় বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে মাথাটি রৌদ্রের উত্তাপ থেকে বাঁচিয়ে বসে বা শুয়ে সকলে বিশ্রাম করছি। আমাদের বাঁয়ে এখনো চতুরঙ্গী হিমবাহ তেমনি তার চারটি রঙের পাথর সারি দিয়ে তুষারস্তূপকে ঢেকে রেখেছে। মাঝে মাঝে তেমনি তুষার-পুকুর। ডানদিকে উচ্চ পর্বতমালার সারি চলেছে, পাহাড়গুলির মাথায় কিছু কিছু তুষার পড়েছে। এই পাহাড় ডিঙিয়েই নেলাং, তিব্বতের সীমানা।

উপর থেকেই লক্ষ্য করছি, পাহাড়ীরা পাহাড়ের খানিকটা নীচের দিকে একটা ঝরনা থেকে জল নিয়ে এসে চা তৈরী করছে। হাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য একটি ছোট তাঁবুর একটা দিক টাঙিয়ে নিয়েছে। ষ্টোভে জল বসানো হল, কেউ কেউ বাসনকোসন ধুচ্ছে, সাজাচ্ছে। অন্যরা কালক্ষেপ না করে নাস্তা খেতে সুরু করে দিয়েছে।

কেৎলি হাতে আমাদের জন্য চা পরিবেশন করতে এসেছে দিলীপ সিং ও বীরসিং। চায়ের সাথে এনেছে তাদের জন্য আনা পাহাড়ী জলখাবার 'চুরমা' ও ছোলাভাজা। ভাজা আটার সাথে চিনি মিশিয়ে চুরমা তৈরী করে ওরা।

এগুলি খেয়ে সহজে চলা যায়, পুষ্টিকরও বেশ। আমাদের বারংবার অনুরোধ করে—বেশী করে খাও, নইলে এমন কঠিন পথ চলবে কি করে ?

আমাদের সাথে বিস্কুট রয়েছে, তাই খাব আমরা। বিস্কুট বিলানোর ভার নিয়েছেন মেজর সাহেব, কিন্তু, পকেটে হাত দিয়েই চমকে ওঠেন—"ওই যাঃ আজ বিস্কুটের প্যাকেটটাই আনতে ভুলে গেছি যে !"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখখানি শুকিয়ে ওঠে, আর আমাদের অন্তরাত্মা তার সাথে সাথে ! আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে দিলীপ ছুটে নীচে ওদের দলের কাছে চলে গেছে। ছোট্ট একটি প্যাকেট এনে দিয়েছে ভুলোমন মেজর সাহেবের হাতে। ওদেরই জন্য আনা বিস্কুট।

আমাদের সবাইর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে। সরল দরিদ্র পাহাড়ী জাতি, দারিদ্র্য এদের চিরসাথী, কিন্তু এদের মায়া, এদের মমতা, নির্ভীকতা, করুণা, সর্বোপরি অদ্ভুত বিশ্বস্ততা আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছে। কতো সহজ সরল এদের ব্যবহার,কতো মিষ্ট কথাবার্তা, কতো আন্তরিকতা এদের কাজেকর্মে ! এই অর্দ্ধসভ্য পাহাড়ীদের মধ্যে এত সদগুণের সমাবেশ দেখে মনে হয় আমরা অন্য কোন দেশে এসে পৌছেছি—এ যেন আমাদের চিরপরিচিত জগৎ নয় !

কিন্তু, আমাদের তথাকথিত সভ্যতা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। তার অগ্রদূত হিসাবে তৈরী হচ্ছে বাস সড়কগুলি। দুর্গম পর্বতাঞ্চলে যাতায়াত সহজ করে দিয়েছে। সমতল দেশের সঙ্গে এখন যাতায়াত করতে আর তেমন কষ্ট নেই, এর ফলস্বরূপ পাহাড়ীদের দুর্লভ গুণগুলিও যেন নীচের গরম হাওয়াতে শুকিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখেছে ওরা, শিখেছে কিভাবে যাত্রীদের ঠকাতে হয়। এদের সহজাত মিষ্ট কথা ও ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। সভ্যতার দান এরা সর্বপ্রকারে গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথ ও বদরীনাথ দর্শন করতে গিয়েছিলাম। হাঁটা পথে প্রত্যেক চটিওয়ালা ও দোকানদার আদর করে ডেকেছে তখন, "আও, বৈঠো আরাম করো, চা পিয়ো, দুধ পিয়ো।"

তাদের মিষ্ট আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারা যায় নাই। চায়ের মধ্যে, দুধের মধ্যে বেশ করে সর দিয়েছে ঢেলে। আপত্তি করলে সস্নেহ ধমক

খেয়েছি। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে বলেছি, "না এখন আর কিছু খাবো না, এইমাত্র খেয়ে এলাম।"

তখন বলেছে,—নাইবা খেলে কিছু। একটু বসে বিশ্রাম করে তো যাও! অনেক পরিশ্রম করেছ, আরও অনেকদূর হাঁটতে হবে। ধীরে ধীরে চলো, বিশ্রাম করতে করতো চলো। আত্মীয়তার সুরে কেউ ডেকেছে 'মাতাজী' বলে, কেউ বা বলে "বহিনজী।"

আর এখন? পথের ধারে দোকান আছে, মালপত্র সাজানো রয়েছে। দোকানদার চুপ করে বসে থাকে বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। কেউ আদর করে ডাকেনা। চা, দুধ খাবার জন্য কেউ আর পীড়াপীড়ি করে না। তোমার প্রয়োজন থাকে খাও, না থাকে তো নিজের পথ দেখ!

এই ধরনের কথা দিলীপও বলে, বলে সরলভাবে নিজস্ব ধরনে। বাস চলাচল সহজ হয়ে যতই 'সভ্যতা' তাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়ছে, ততই ওদের দিনগুলি গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। অল্পেতে এখন ছেলেপুলেরা খুসী হয় না। বৌ-ঝিয়েরা পাহাড়ী দুনিয়ার বাইরে নজর দিতে শিখেছে।

বলে বাবুজী, আজ যদি আমার বউ বাসের ড্রাইভারের সাথে পালিয়ে যায়, নতুন দুনিয়া দেখবে বলে, তবে আমি কার দোয দেব? সব দোষ এই নসীবের বাবুজী!

এদের চোখমুখে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, সভ্যজগতের স্পর্শে। কিন্তু এ তো মেনে নিতেই হবে, সভ্যতার অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব নয়!

আমরা আবার এগিয়ে চলেছি পাহাড়ের গায়ে গায়ে পা ফেলে, কখনো বা চতুরঙ্গী হিমবাহের ধারের গিরিশিরা ধরে ধরে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখি, দূরে যেখানে গিরিশিরার শেষপ্রান্ত বেঁকে গেছে নীল আকাশের গায়ে, মনে হোল যেন কার গৈরিকপ্রান্ত সূর্য্যালোকে ঝল্‌সে উঠলো। চোখের ভুল নয়তো?

না, না, একটু এগিয়েই পাহাড়ের শেষ প্রান্তে স্বামী সুন্দরানন্দের শ্মশ্রু-সমাচ্ছন্ন হাসিভরা মুখখানি দেখা যায়। আমরা বাসুকি হিমবাহের কাছে পৌছে গেছি। বাসুকি হিমবাহের দক্ষিণ দিক থেকে এসে চতুরঙ্গী হিমবাহে মিলিত হয়েছে। এবার ঝুরঝুরে বালি ও পাথরের পথ বেয়ে নীচের দিকে আমাদের নামতে হবে।

পথ? পথ বলে তো এ রাজ্যে কিছু নেই। পা ফেলে চললেই পথ চলা হ'ল। কিন্তু এখানে তা-ই বা ফেলবো কি করে?

এই জন্যই সুন্দরানন্দজী দাঁড়িয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। বিপজ্জনক পথের শুরু হয়েছে আবার। আমাদের আনা Ice-axe হাতে নিয়ে স্বামীজী পাহাড়ের গায়ের বালি ও পাথর ঠেলে ঠেলে সরিয়ে পা ফেলবার জায়গাটুকু তৈরী করছেন। দিলীপও সাথে সাথে হাত এগিয়ে দিয়েছে, তার কাজে। পাহাড় কেটে কেটে এমনি তৈরী করা পথে দিলীপ, বীরসিং ও স্বামীজীর হাত ধরে ধরে নেমে এসেছি সবাই। আমাদের দলে কেবল দাদার হাত ধরবার দরকার হয় না। উনি পাহাড়ে পাহাড়ে চলে অভ্যস্ত, তাই চলেন প্রায় পাহাড়ীদের মতন।

বীরসিং এদেশের লোক নয়, গাড়োয়ালের অন্য অঞ্চলে ওর বাস। হৃষিকেশ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। এ পথে আসা ওর এই প্রথম। তবে পাহাড়ীলোক, পাহাড়ে পর্বতে বহু ঘুরেছে। তাই দুর্গম পাহাড়ী পথে চলতে ওস্তাদ। সেও তাই হাত এগিয়ে দিয়েছে পথ তৈরীর কাজে। বীরসিং আসলে আমাদের রান্নার লোক, দাদার পুরাতন পরিচিত।

এতখানি সাহায্য পেয়েও দুর্গম পথে অনেকখানি নীচে নেমে আসতে আমাদের বেশ কষ্ট পেতে হয়। নীচে নেমে, বাসুকি হিমবাহের মস্ত একটা পাথরের উপর শুয়ে পড়েছি সবাই। বিশাল শুভ্র পাথরটির উপরিভাগ বেশ সমতল, যেন আমাদের বিশ্রামের জন্যই ওটিকে ওখানে রাখা হয়েছে।

আমাদের চলার পথের ডানদিক থেকে দুটি প্রস্তরময় পর্বতের মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে একটি শুভ্র ঝরনা। তারই উপর যেন সাঁকো তৈরী করেছে পাথরটি। আমাদের নীচ দিয়ে কলকল করে জলস্রোত বয়ে চলেছে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি, পর্বত দুটির চূড়া থেকে একটি তুষার স্রোত নেমে এসেছে দুই পাহাড়ের মাঝখানটি দিয়ে। তুষার স্রোতের শেষ প্রান্তে একটি বিশাল নীলাভ তুষার-গহ্বর। তারই মধ্য থেকে তুষার গলে গলে আসছে, যেন তরল রৌপ্য! চারিদিকে ধব্‌ধবে সাদা রঙের পাথর ছড়ানো। সবই শুভ্র। তার উপর দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্যালোক পড়েছে। চারিদিক যেন জ্বলছে। আমাদের চোখ তাকালেই ঝল্‌সে যাচ্ছে।

তাইতো! আমরা যে আর একটুও তাকাতে পারছি না। আমাদের

চোখ উজ্জ্বল আলোর ঝলসানিতে বুজে এসেছে। তাই, বাধ্য হয়ে চোখ বুজেই শুয়ে আছি, আমরা চারজনাই। ঝরনার ওপারে স্বামীজীর আদেশে আবার চা তৈরী হচ্ছে, কিন্তু চোখ খুলে তাকিয়ে দেখবার সাধ্যও নেই আমাদের।

আর, ওরা? ওরা কিন্তু দিব্যি গগ্‌লস্ পরে নিয়েছে। ওদের পকেটে ছিল আমাদেরই দেওয়া কালো চশমা। ওরা তাই পরে নিয়েছে। নিমীলিত নেত্র আমাদের বলে, তোমরাও পরে নাও না কেন?

কিন্তু আমরা তো বের করে রাখিনি যে পরবো? ওগুলি তো অন্যান্য মালের মধ্যে সযত্নে রাখা আছে। তাই বোকার মতন আমাদের চোখ বুজে পড়ে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? চোখ বুজে বুজেই নাস্তা ও চা খেয়ে নিয়েছি। সকাল থেকে তিন বার চা খাওয়া গেল, মনে হচ্ছে গায়ে বেশ বল পাচ্ছি। চা খাওয়া শেষ হবার পর আবার চলা শুরু।

এবার আর সহজ পথ নয়। ঝরনা পার হয়ে আবার তেমনি ঝুরঝুরে বালি পাথরের পথ। হিমবাহের বয়ে আনা পাথর জমে জমে স্তূপ হয়ে পাহাড় তৈরী হয়েছে, কত কোটী বছর ধরে হিমবাহ এইভাবে হিমালয়কে ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো করছে, কে জানে। Ice-axe দিয়ে তারই গায়ে গায়ে পথ তৈরী করে চলা। আজ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। স্বামীজী এখন আর এগিয়ে নেই। দিলীপ ও তার দলের সহায়তায় কখনো পথ কাটছেন, কখনো আমাদের হাত ধরছেন। খাড়া দেয়ালের মত পাহাড়, নীচের খাদে জমা বিশাল বিশাল পাথরের স্তূপে পড়লে কেউ আর আস্ত থাকবো না।

নতুন হিমবাহ রাজ্য শুরু হয়েছে আবার। আবার হিমবাহের জমা পাথরে তৈরী পাহাড়ের উঁচুতে উঠে গিরিশিরা ধরে চলতে শুরু করেছি। গিরিশিরাতে চলার মস্ত সুবিধা এই যে উপর থেকে পাথর গড়িয়ে এসে পড়বার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিপজ্জনক খুবই। খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। হঠাৎ পা ফসকালে কি হবে, চিন্তা করাও যায় না। এত বিপজ্জনক পথ, কিন্তু, আমাদের মন বেশ নির্বিকার, নিশ্চিন্ত, যেন বোধহীন!

পৌনে চারটার সময় হিমবাহের পাহাড়ের উপর একটা ছোট মালভূমিতে পৌঁছে গেলাম। এই মালভূমিটি রুক্ষ নয়। সুন্দর সবুজ ঘাস ঘন হয়ে

জন্মেছে, ছোটছোট গাছে নানা রঙের ফুলও ফুটেছে। আজ এখানেই থামবো আমরা।

স্বামীজী আজ আমাদের উপর খুব খুসী। আমরা তাঁর পছন্দ মতন চলতে পেরেছি। আমরাও আমাদের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট। মেজর সাহেব আর উনি নিজেদের আজকের কৃতিত্বের গৌরবে গর্বিত হয়ে, নিজেদেরই বাহ্বা দিতে শুরু করেছেন। আমি ও দাদা চুপ করে থাকলেও, মন আজ আমাদের খুসীতে হালকা মনে হচ্ছে।

প্রচণ্ড শীত। পথ চলবার সময় শীতের প্রখরতা বোঝা যায় না। পরিশ্রমের উত্তাপে দেহ উত্তপ্ত থাকে। এখন বিশ্রাম করতে বসে দেখি, একদিকে যেমন ঘামে গায়ের ভিতরের জামা ও মোজা ভিজে গেছে, ওদিকে কন্‌কনে হাওয়াতে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। বেশ ঝর্‌ঝরে দিনটি। রোদের তেজও কম নয়। পাথরগুলি বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে। বিশ্রাম করবার জন্য পাথরের উপর সবাই বসে পড়েছি। একটা বড় পাথরের ধারে ওঁরা দুই বন্ধু উনি ও মেজর সাহেব বসেছেন, আর একটা পাথরের ধারে হাওয়া বাঁচিয়ে বসেছেন দাদা, তাঁর পাশে আমি। দুই দলের মাঝে মস্ত একটা পাথরের আড়াল।

জুতো মোজা খুলে পাদুটিকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে রৌদ্রে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছি। একটু পরেই পাথরের আড়াল থেকে দুটি হিংসুটে মুখ উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে!

"দেখনা, দেখনা একবার! গদগদ হয়ে দাদার আদর খাওয়া হচ্ছে! দেখনা কাণ্ডখানা একবার! ইস!"

মেজর বন্ধুর গলা শোনা যায়। ওঁরও মুখের কিয়দংশ দেখা দেয়। প্রশান্ত মুখে দাদা হাসতে থাকেন, ওদের কাণ্ড দেখে!

সাথে সাথে যেন হাসতে থাকে সামনে পাহাড়ের ফাটলের ফুলগুলিও। হাওয়াতে তাদের মাথা দুলে দুলে ওঠে,—যেন হাসির দমকে গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে!

এখানে বসে বসে সম্মুখে বাসুকি (২২, ২৮৫ ফুট) পর্বত শিখর দেখা যাচ্ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে শিখরটির তুষারের ঝিকিমিকি চোখে পড়ছে। আকৃতি দেখে মনে হয় যেন বাসুকির ফণা। আমাদের আশ্রয় দিচ্ছে সেই

ফণার তলায়! অপূর্ব সৌন্দর্যময় শখর, সেও কি ওদের কাণ্ড দেখে হেসে উঠেছে?

আমাদের মালপত্র বহন করে পাহাড়ীরা কিন্তু আমাদের মত গিরিশিরা ধরে চলেনি। ওরা দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী জমা পাথরের উপর দিয়ে এতক্ষণ চলছিল। আমরা যখন মালভূমিতে ওদের অপেক্ষায় বসে আছি, ওরা তখন ওই পাহাড়েরই নীচে একটুকরো সমভূমি বেছে নিয়ে তাঁবু খুলে লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। সমভূমির মাঝখানে একটা বেশ বড় স্বচ্ছ সবুজ জলের পুষ্করিণী। তারই লালরঙের পাথর ছড়ানো তীরে ওরা আস্তানা পাতবার উদ্যোগ করছে। দুটি তাঁবু লাগানো প্রায় শেষ হয়ে এল। পাহাড়ের উঁচুতে শুয়ে শুয়েও আমরা ওদের বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পিঁপড়ের মত দেখাচ্ছে মানুষগুলিকে, লাল-হলদে রঙের খেলাঘর পাতা শুরু করে দিয়েছে তারা।

কিন্তু রঙিন খেলাঘর পাতা ওদের বন্ধ করতে হ'ল। স্বামীজী শিস দিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডাকলেন, হাত নেড়ে ইসারা করলেন উপরে উঠে আসতে। ওদের সাজানো ঘর আবার ভেঙে ফেলে উঠে আসতে হ'ল। অসন্তুষ্ট মনে মালপত্র গুটিয়ে ওরা চড়াই উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু এই চড়াই টুকু উঠতেই একঘণ্টারও বেশী সময় লাগলো ওদের। খুব পরিশ্রান্ত হয়েছে আজ ওরা। তাছাড়া মনে হচ্ছে, আজ প্রথম উচ্চতার জন্য অক্সিজেনের অভাব বোধ হচ্ছে ওদের অনেকেরই।

স্বামীজীর মতে, আজ আমরা ( ১৬,০০০ ফুট ) ষোল হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি। বাসুকি হিমবাহ ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম পার হয়ে চতুরঙ্গীতে আমাদের তাঁবু পড়েছে আজ!

দিনমানে চলা শুরু করবার পর হরচাঁদের দেখা আর মেলে না। কিন্তু সকালে ও সন্ধ্যায় চলার শুরুতে ও শেষে তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল একটিবার অন্ততঃ আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। সাথে সাথে নানারকম খবরাখবরও সে নিয়ে যায়। আজ এক্ষুনি এসে জানালো, মালভূমির উপর যে ঝর্নাটির প্রত্যাশা করে স্বামীজী এখানে তাঁবু ফেলবার আদেশ দিয়েছেন, সেটি প্রায় শুকিয়ে গেছে। জল পাওয়া যাচ্ছে না!

আমাদের করবার কিছুই নেই। চুপ করে আমরা তেমনি পাথরে হেলান

দিয়ে নির্বিকার ভাবে শুয়ে রইলাম। দূর থেকেই দেখছি, স্বামীজী ice-axe হাতে নিয়ে চলেছেন, দিলীপ তাঁর পিছন পিছন চলেছে। আমাদের সংবাদ-দাতা আবার সংবাদ পরিবেশন করলো—স্বামীজী পাথর সরিয়ে জমি খুঁড়ে জল বের করেছেন।

'ফিকর্ মৎ করো, ও সব ঠিক হো যায়গা'—সে আবার চিন্তা করতে বারণও করে যায়, যেন আমরা কতো দুর্ভাবনা প্রকাশ করেছি। আমরা তবু নির্বিকার! আমাদের তাঁবু টাঙানো হয়ে গেছে। রোদ পড়তেই আমরা তার ভিতরে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়েছি।

কতো রাত হয়েছে জানিনা, দিনের শেষে তাঁবুর ভিতর ঢুকলেই রাত মনে হয়। বীরসিং-এর ডাকে তাঁবুর দরজার গর্ত দিয়ে মুখ বের করি। রাতের খাবার এসেছে। ভাত আর ডাল। মুখে দিয়েই তার স্বাদে বুঝলাম, স্বামীজীর হাতের রান্না, পেঁয়াজকুচি দিয়ে টকডাল রেঁধেছেন, মাদ্রাজী আস্বাদ। যেন অমৃত খাচ্ছি। এত উচ্চ প্রদেশেও ভাত-ডাল বেশ সিদ্ধ হয়েছে তো!

তৃপ্তি করে খেয়ে, বেশ আরামে ঘুমিয়ে পড়েছি সবাই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন শুনতে পাচ্ছি, যেন স্বামীজীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর! কেন? সাথে সাথে এ কার কণ্ঠ? ক্রন্দনস্বরে কি বলছে? আজতো স্বামীজী বেশ খোসমেজাজে ছিলেন! কান পেতে শুনবার চেষ্টা করি। কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। কি জানি! স্বপ্ন নয়তো?

## অনামা হিমবাহ—বাসুকি-বন—সুরালয় হিমবাহ সঙ্গম

২১শে জুলাই। ভোর হ'ল কন্‌কনে শীতের মধ্যে, কালরাত্রে খুব শীত ভোগ করেছি। সারারাত ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েছে, সাথে সাথে হাওয়া। হাওয়া নিরোধক ( wind proof ) তাঁবু বলেই যা রক্ষা। ভিতরে বাতাস ঢুকতে পায়নি, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়েছে যে তাঁবু শুদ্ধ উড়ে যাবে, নয়তো যে পাথরগুলিতে তাঁবুর দড়ি বাঁধা হয়েছে, সেগুলি উঠে এসে আমাদের গায়ে পড়বে !

সকালে তাঁবু ছেড়ে বের হয় কার সাধ্য ! ভীষণ শীত ! তাঁবু ভিজে গিয়ে এত ঠাণ্ডা হয়েছে যে ছোঁয়া যায় না। বাইরে বালতিতে মুখ ধোবার জল রাখা হয়েছিল, তার উপর পাতলা বরফের সর ভাসছে। চারিদিকের পাহাড় বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। ঘন কুয়াশা আমাদের ঘিরে রেখেছে। একটু দূরে স্বামীজীর তাঁবু, তাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যেদিকে কুয়াশা হালকা হ'ল, আবছা আবছা দেখা গেল, পাহাড়ে হালকা নরম তুষার পড়ে সাদা হয়ে গেছে !

সূর্য্যদেবের চিহ্ন কোথাও নেই। বেলা বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে আমাদের পথ চলা শুরু করতে হবে। সুতরাং আমরা চা খেয়ে তৈরী হয়ে নিয়েছি। জলে ভিজে তাঁবুগুলি বেজায় ভারি হয়ে উঠেছে। কুলিরা যে কি করে সেগুলি বইবে আজ কে জানে।

আমরা আজ আপাদমস্তক গরমকাপড়ে আচ্ছাদিত করে তার উপর বর্ষাতি চাপিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করেছি। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন স্বামীজী। আজ তিনি আমাদের সাথে সাথেই রয়েছেন। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। একটু লক্ষ্য করতেই দেখি, বৃষ্টি তো নয়, হালকা তুলোর মত তুষার পড়ছে ; গায়ে পড়তে পড়তেই জল হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কাল বিকালের মত আজও আমরা হিমবাহের উপর দিয়ে চলেছি।

বাসুকি ও চতুরঙ্গী হিমবাহ সঙ্গম পার হয়েছি কালকেই। আজ আবার চতুরঙ্গীর ধার ধরে চলেছি। কালকের মতই পথ। পাথরের তৈরী ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে দিয়ে পাথরের পর পাথরে পা ফেলে চলেছি। যতটা সম্ভব গিরিশিরার উপর দিয়ে নিয়ে চলেছেন স্বামীজী। কখনো উঠছি, কখনো নামছি, কিন্তু মোটের উপর চড়াই উঠছি। কিছুদূর এগিয়ে একটা উৎরাই-এর মুখে সামনে তাকিয়ে দেখি, বিশাল একটি শুভ্র তুষারস্রোত উপরের পাহাড় থেকে নেমে আমাদের পথে পড়েছে। আমার দলের সকলেই আমার চেয়ে ভালো হাঁটেন, কিন্তু আজ ঠিক এই মুহূর্ত্তে কি করে যেন আমি এগিয়ে রয়েছি। কারণ আর কিছু নয়, পথ খারাপ বলে স্বামীজী মন্থর গতিতে এগোচ্ছেন আজ। তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করে আমরা চলেছি।

স্বামীজী কখনো আমার স্বামীর হাত মুঠো করে ধরে চলেছেন, কখনো বা আমার হাত ধরছেন। বড তাড়াতাড়ি চলেন বলে আমি স্বামীজীর পদক্ষেপের সাথে তাল রাখতে পারি না। তাই দিলীপকে ইসারা করে ডেকে নিয়েছি। সে আমার হাত আল্‌গা মুঠিতে ধরে রেখে আমার সাধ্য ও শক্তি মতন চলতে দিচ্ছে। কেবল কঠিন উৎরাই পথ পেলে বা কোথাও পড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখলেই সে মুঠি বজ্রকঠিন হয়ে ওঠে।

সত্যেনবাবু অর্থাৎ মেজর সাহেব হয় স্বামীজীর, না হয় দিলীপের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। দাদা সর্বদাই আমার পিছনে পিছনে চলছেন। অর্থাৎ দাদা ও সত্যেনবাবু চালাক লোক। আমরা কষ্ট করে চলে চলে পথ তৈরী করছি, ওঁরা আমাদের কষ্টের ফলভোগ করছেন।

চারিদিকে কুয়াশা ঘন হয়ে ঢাকা থাকলেও তুষারস্রোত ও তার দু'পাড়ের পাহাড়দুটি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটি পাহাড়ের উপর তো আমরাই দাঁড়িয়ে আছি। এবার নীচে নেমে তুষারস্রোত পার হওয়া।

তুষারস্রোতটি দেখেই মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে। হিমবাহের পথে তুষারস্রোত আমরা এই প্রথম পার হচ্ছি। পাথরে পাথরে চলে বিরক্তি ধরে গেছে!

হঠাৎ বলে উঠি, "আমি সবচেয়ে আগে ওই হিমবাহ পার হবো কিন্তু।"

ছেলেমানুষী কথা শুনে সবাই হেসে উঠেছে। স্বামীজী ঘাড় নাড়েন। দিলীপ এগিয়ে চলবার ইসারা করে। ওর হাত ধরে দ্রুত এগিয়ে চলি,

পাছে কেউ আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। চলতে চলতে চির সাবধানী দিলীপ সতর্ক দৃষ্টিতে পিছনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে,—না প্রয়োজন নেই, ওদের সাহায্যের জন্য বীর সিং তৈরী হয়ে রয়েছে।

সত্যেনবাবু আছাড় খাচ্ছিলেন প্রায়, কোনমতে সামলে উঠেছেন—স্বামীজী ফিরে এসে হাত ধরতে চেয়েছেন,--"উঁহু"—সত্যেনবাবু ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হিমবাহের শুভ্র তুষারস্রোতের উপর হেঁটে হেঁটে সাবধানে পার হতে থাকি। বড় পিছল। তাছাড়া অজস্র ফাটলে ভরা। ফাটলগুলি তুষার-স্রোতের এ প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রসারিত! দেখে মনে হয়, কেউ একটি ধারাল তরবারি দিয়ে কেটে রেখেছে! ফাটলের মধ্যে দিয়ে তির তির করে সরু সরু জলধারা বয়ে চলেছে।

হিমবাহের তুষারস্রোত পার হয়ে আবার পাথরের টিলাতে ওঠা। পুনরায় নেমে আসা।

এবারকার কাজটি কিন্তু অত সহজ নয়। তুষার বালি পাথরে মিলে জবড়জং অবস্থার একটি কঠিন উৎরাই। তারই গা বেয়ে নেমে আসা। প্রাণের মায়া ত্যাগ না করলে, মনে হয় অসম্ভব। তবু তেমনি পাহাড় বেয়েই তো নীচে নেবে এলাম! তিনজনার প্রাণপাত পরিশ্রমে পাহাড় কেটে কেটে পা রাখবার ধাপ তৈরী করা, সেই পথে আমাদের মত অপটু লোককে নীচে নামিয়ে আনা একটি আশ্চর্য কৌশলের কাজ সন্দেহ নেই।

এই হিমবাহটি মনে হয় যেন শতপন্থ শৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে, কিন্তু ম্যাপে এর কোন নাম দেয়া নেই।

এবার আমরা হিমবাহের তুষারক্ষেত্রে পৌঁছে গেছি। তুষারক্ষেত্রে নেমে আসবার আগে পাহাড়ের উপর এক জায়গায় স্বামীজী কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। সামনের দিকে দূরে নির্দেশ করে বাঁ হাত প্রসারিত করে দেখালেন এক আশ্চর্য তুষার-গহ্বর। হিমবাহের ভাঙাচোরা উঁচু-নীচু পাহাড়ের একাংশে একটি তুষারের বিরাট দেয়াল, তারই মধ্যে মস্ত একটি গহ্বর। নীলাভ-শুভ্র স্বচ্ছ তুষারের দেয়ালে, নীলাভ-স্বচ্ছ গহ্বরের মধ্য থেকে শুভ্র-স্বচ্ছ জলধারা কলোচ্ছ্বাসে নির্গত হয়ে আসছে। এই হ'ল Ice Cave!

অপূর্ব সুন্দর দেখতে Ice Caveটি। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি সবাই। পা আর এগোতে চায় না।

কিন্তু আমাদের বেশীক্ষণ থামবার উপায় নেই। স্বামীজী সহাস্যমুখে এগিয়ে চলার নির্দেশ দেন। বড় বিপজ্জনক রাজ্য এসব। নিরাপদ আশ্রয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

আমরা পাথর বালি তুষারের ভয়াবহ পথ বেয়ে নীচের তুষারক্ষেত্রে পৌঁছে গেছি। চারিদিক তুষারে ঢাকা। এখন আর পাথরের স্তূপ নয়। ছোট, বড়, মাঝারি, নানা আকারের পাথর তুষারের ময়দানের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। কোথাও অল্প-স্বল্প তুষার গলেছে, সেখানে ছোট ছোট ধারা তির্‌তির্ করে বয়ে চলেছে। কোথাও ছোট ছোট পাথর তুষারের ভিতর বসে ডুবে গেছে, তার মাথার দিকের একটু একটু দেখা যাচ্ছে! একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে পাই, স্বামীজীই দেখান। যে পাথরগুলি বিশালায়তন, তার মধ্যে অনেকগুলি প্রান্তরে পড়ে নেই। সেগুলি বরফের স্তম্ভের উপর শূন্যে বসান রয়েছে একটি দুটি নয়, বিশাল প্রান্তরে যতদূর নজরে চলে এমনিভাবে শত শত পাথর বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথির মত উচ্চাসনে বিরাজ করছে।

চারিদিকে পাহাড় খুব দূরে রয়েছে, কাছে কোনটি নেই, কেবল দিগন্ত বিস্তৃত হিমবাহ রাজ্য প্রসারিত রয়েছে। আমরা ভাবছি, আর বলাবলি করছি, এত বড বড পাথর এলো কোথা থেকে? এসে আবার তুষারস্তম্ভের উপর এঁটে বসে আছে!

স্বামীজীর মতে, অতীতে এই হিমবাহ আরও অনেক উঁচু ছিল। আশ-পাশের পাহাড় তুষার পতনের ফলে ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে ছোট বড় নানা আকারের পাথর গড়িয়ে এর উপর পড়েছিল। তার উপর প্রতিবৎসর ক্রমাগত তুষার পতনের ফলে জায়গাটা সমভূমির আকার ধারণ করেছে। তুষার স্রোতের গতির সাথে সাথে ছোট ছোট পাথর, বালি এগিয়ে হিমবাহের অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশে চলে গিয়েছে, কিন্তু বড় পাথরগুলির পক্ষে বেশীদূর এগোনো সম্ভব হয়নি, সেগুলির কোন কোনটি তুষার ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করেছে, এখন সেগুলি এর গর্ভেই আছে, বাকিগুলি উপরিভাগে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে।

সূর্যের উত্তাপে বিশাল পাথরগুলির চারিপাশের তুষার গলে যায়, কিন্তু এগুলির ঠিক নীচে উত্তাপ পৌছাতে পারে না, তাই তুষারও গলে না। ফলে ওই রকম স্তম্ভের সৃষ্টি হয়েছে। ভূবিদ্যাতে এদের বলে "Glacial Table"।

যে ছোট পাথর বসে গেছে তার উপরে জল জমেছে, তাকে বলে Ice Cup।

আমরা তুষারক্ষেত্রের শেষপ্রান্তে এক একটা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করতে করতে স্বামীজীর সাথে এই সম্পর্কে আলোচনা করছি। সঙ্গে সঙ্গে লজেন্স, বাদাম, মিছরি খাচ্ছি। জল তো পায়ের নীচে দিয়ে বয়েই চলেছে, অঞ্জলি করে তুলে মুখে দেবার অপেক্ষা মাত্র। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে একটি সঙ্গীতস্বর কানে আসে। স্বামীজী খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠেন—

"ওই দেখ, জ্ঞানা গান জুড়েছে। জ্ঞানানন্দ আমাদের মালবাহক।

তুষারক্ষেত্র পার হয়ে হিমবাহের পাথর ঢাকা অংশে আমাদের পাহাড়ী সাথীরা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করছিল, পাশে তাদের বোঝাগুলি নামিয়ে রাখা। জ্ঞানা গান গাইছে, তার সাথে সুর মিলিয়েছে। সদা হাস্যময় গঙ্গা সিং। আমাদের পূর্বেকার গোমুখ তীর্থ দর্শনের পথে জ্ঞানানন্দ সঙ্গী হয়েছিল, দুর্গম পথে আমরা যখন চলতে পারছিনা, তখনো সে গান গাইতে কসুর করতো না।

ভারি ভালো লাগছে এই প্রাণশক্তিতে উচ্ছল লোকগুলির সাহচর্য্য! কি বলে ওদের ধন্যবাদ দেব বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের আনন্দ জানাবার জন্য ওদের কয়েকটা টুকরো মিছ্‌রী ও লজেন্স হরচাঁদের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই ওদের। ওরা পেয়েছে,—দূর থেকেই হাত নেড়ে ইসারা করে জানায় যে খুব খুসী হয়েছে ওরা।

তুষারক্ষেত্র পার হয়ে আবার পাথর স্তূপের উপর দিয়ে উঠে উঁচু নীচু পথে চলা। আমাদের পক্ষে যেন বিভীষিকা। দল বেঁধে খুব ধীরে ধীরে চলেছি। পথ দেখাচ্ছেন স্বামীজী। মাঝে মাঝে দিলীপের সাথে পরামর্শ করে নিচ্ছেন। কেননা, হিমবাহের রূপ একরকম থাকেনা। গত বৎসর যে দিকের হিমবাহ ধরে এসেছিলেন, এ বৎসর সেদিক দিয়ে চলবার উপায়ই নেই। মস্ত একটি অংশ ধসে খাদ হয়ে গেছে। অন্য দিকে চলার পথ খুঁজে নিতে হবে।

দেওয়ালের মত খাড়া একটা ধসা পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝুরা পাথরের উপর দিয়ে সার বেঁধে চলেছি। খুবই কঠিন পথ। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। পরিশ্রান্ত হলে বেশীর ভাগ একটু থেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিশ্রাম করতে হয়, বসা চলে না কোথাও। বসবার মত নির্ভরযোগ্য পাথর নেই

বললেই হয়। শিথিল প্রস্তর-স্তূপ! সম্মুখে স্বামীজী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর পিছন পিছন চলেছি উনি, আমি, দিলীপ, সত্যেনবাবু, সর্বশেষে বীরসিং ও দাদা। চলতে চলতেই দাঁড়িয়ে থেমে দম নিয়ে নিচ্ছি। এমনি একবার বিশ্রামের জন্য যখন সবাই থেমেছি, কয়েকটা বসবার যোগ্য পাথরও পেয়েছি, পিছনে হঠাৎ গড়্‌গড়্‌ করে একটা শব্দ।—সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদ!

কি হ'ল? কি হ'ল? চেঁচিয়ে উঠি একসঙ্গে।

দাদা! দাদার কি হ'ল? আঘাত পেয়েছেন? সবই আতঙ্কে শুকিয়ে উঠেছি।

"না, না।" দাদা বলছেন—"না না, সে সামান্য! আঙুলে সামান্য লেগেছে। সে কিছু না কিন্তু—"

হাতে তুলে দেখান, তাঁর Ice-axe খানি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে!

সামান্য পিছিয়ে পড়েছিলেন দাদা। বীরসিং তাঁর সাথে সাথেই বরাবর ছিল। সে দাদার পিছিয়ে পড়ার সুযোগে একখানি পাথরে উঠে বসেছে। দাদা এসে পৌঁছাতেই তাড়াতাড়ি নেমে তাঁর বসবার স্থান করে দিচ্ছিল। কিন্তু যে পাথরটির উপর সে বসেছিল, সেটি স্থানচ্যুত হয়ে তৎক্ষণাৎ গড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে দাদা তাঁর Ice-axe খানি পাথরে হেলান দিয়ে রেখে হাত সরিয়ে নিচ্ছেন। পাথরখানি গড়িয়ে, তাঁর হাত ঘেঁষে Ice-axeটির উপর পড়েছে। তাঁর হাতের আঙুলে সামান্য চোট লাগলেও বিশেষ ক্ষতি হয় কি। পাথরটা আর পাঁচ ইঞ্চি ডানদিকে পড়লে তাঁর গায়েই পড়তো। মস্তবড় একটা অপঘাতের হাত থেকে সেদিন বাঁচা গেল বটে, কিন্তু দাদার সাধের Ice-axe খানা ভেঙে দুটুকরো একেবারে! ওটি একেবারে অকেজো হয়ে গেল। এই কয়দিন চলার পথে ওটি ওঁর নির্ভরশীল নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

আর বিশ্রাম নয়। আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। যত শীঘ্র সম্ভব এই ভয়াবহ পথটুকু অতিক্রম করে যেতে হবে। প্রায় বারোটা নাগাদ উঁচু পাহাড়ের উপরে একটা ছোট উপত্যকাতে পৌঁছানো গেল। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা অপূর্ব সৌন্দর্য্যময় একটি কানন যেন! হিমবাহ-রাজ্যে একেবারে বেমানান—মরুভূমিতে যেন "ওয়েসিস।" স্বামীজী বলেন,—"বাসুকি-বন।"

সবুজ মখমলের মত ঘন ঘাসে ঢাকা, ছোট-ছোট নানারঙের ফুলভরা ছোট

ছোট গাছ আঁকা মোজেইক করা অঙ্গন! মাঝখান দিয়ে শীর্ণকায়া একটী সুন্দর স্বচ্ছ-নীল-জলধারা উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

সযত্নে সাজানো অঙ্গনটি কে যেন আল্‌গোছে রুদ্ররাজ্যের উপরে তুলে ধরে রেখেছে। চারিদিককার ভাঙনের খেলার ছোঁয়াও এখানে পৌছাতে পারে নি।

অপূর্ব রমণীয় স্থান। হিমবাহ রাজ্যের মধ্যে প্রায় সাড়ে ষোল হাজার (১৬,৫০০ ফুট) ফুট উঁচু এই কাননের অস্তিত্বই অবিশ্বাস্য! ভীত সন্ত্রস্ত ভাব কেটে গেছে আমাদের। আমরা সকলে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছি।

আমার স্বামী বলছেন, আজ এই কাননের নাম দিলাম আমরা "উমাপ্রসাদ কানন"।

মনে একটা সদিচ্ছা উঁকি মেরে যায়, উনি তো মুখে প্রকাশই করে ফেল্লেন, "আজ এখানে ক্যাম্প করলে বেশ ভালো হ'ত!"

বিশ্রাম করবার জন্য ফুলের উপরই প্লাষ্টিকের চাদর পেতে আমরা শয্যা বিছিয়ে নিয়েছি, পাথর হয়েছে আমাদেব বালিশ। প্লাষ্টিকের ভিতর দিয়ে শয্যার নীচের ফুলগুলি দেখা যাচ্ছে। যেন রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা!

শুয়ে শুয়ে ফুলগাছ ও ফুলগুলিকে নিরীক্ষণ করে চলেছি। সাড়ে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে তো স্বাভাবিক কোন গাছ হওয়া বা ফুল ফোটবার কথা নয়! কেমন ধরনের ফুল ফুটেছে এখানে? অবাক হয়ে দেখি, কি করে এই গাছের বীজ সর্বপ্রথম এখানে এলো?

গাছগুলি উঁচুতে পাঁচ ছয় ইঞ্চির বেশী নয়। এক একটি ছোট ছোট ঝোপ হয়ে জন্মেছে। সরু সরু ডাল, ডালগুলির প্রতিটি গাছের গোড়া থেকে বেরিয়েছে। পাতাগুলি গাঢ় সবুজ রঙা, ছুঁচালো সরু সরু। ফুলগুলির পাপড়িও সরু ছুঁচলো। শত শত রঙিন ছুঁচ যেন বৃত্তাকারে সাজিয়ে সাজিয়ে ফুলটি তৈরী। শক্ত, রুক্ষ। হলদে, মেরুণ, বাদামী এই তিনটি রঙের ফুলেরই প্রাধান্য, কঠিন প্রস্তর রাজ্যের উপযুক্ত অবয়ব। কিন্তু বহু ফুলের সম্মিলিত রূপ,—সে যে অপরূপ!

মেজর সাহেব তাঁর মনের উচ্ছ্বাস দমন করতে পারছেন না। উচ্ছল হয়ে উঠে রসিকতা শুরু করেছেন তাঁর বন্ধুর সাথে।

—"ওরে তোরা এখানে পাশাপাশি শুয়ে পড় দেখি! Natural ফুলশয্যা হয়ে যাবে। দিব্যি মানাবে।"

আমরা চকোলেটের সাথে চা খেয়ে নিয়েছি। বিশ্রামও করা হ'ল। আবার পথ চলা শুরু করতে হবে। "উমাপ্রসাদ কানন" ছাড়তে মন চাইছে না।

কিন্তু পথ চলা আমাদের লিখন—কেবলই চলা। থেমে থেমে নৈসর্গিক দৃশ্য দেখবার আনন্দ উপভোগ করা নয়, চলতে চলতেই ফাঁকে ফাঁকে সুন্দরকে দেখা, তাঁর অপরূপ রূপরাশি উপলব্ধি করা। ভয়ঙ্করের রূপও এমনি চলতে চলতেই দেখছি, ভাল করে উপলব্ধি করবার আগে সে রাজ্য পরিত্যাগ করেও এসেছি। থেমে থাকা আমাদের ধর্ম নয়।

স্বামীজী বলছেন, গত চার ঘণ্টায় আমারা মাইল দেড়েক এসেছি। আরও দুই মাইল গেলে ক্যাম্প করবার ভালো জায়গা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ স্বামীজীর ইচ্ছে, আমরা আরও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা হাঁটি। তবে নেহাৎ না পারলে, কাছের পাহাড়টা (ভগবান জানেন কেমন বড় সে পাহাড়) ঘুরলেই আর একটা ক্যাম্প করবার জায়গা পাওয়া যাবার সম্ভাবনা। সেখানে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যাওয়া যায়। আমরা ঘণ্টা দুই চলতে রাজী। তাই আবার রওনা হওয়া গেল।

সবাই বেশ ধীরে ধীরে চলেছি। কিন্তু কি হ'ল আমার! আমার সব শক্তি কি আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে? পা যে আর চলে না! দম পাই না, চোখে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। মনটি কেবল সতেজ। চলতেই হবে। উমাপ্রসাদ কাননেও মনে হয়নি যে এমন অবস্থা হবে আমার। তাই লাঠিটাও দিয়ে দিলাম ওঁকে। ভেবেছি, আমি হালকা মানুষ, কোনরকমে ওদের কারুর হাত ধরে ধরে চলে যাব। আমাকে সাহায্য করা দিলীপ বা সাধুজীর পক্ষে অনেক সহজ হবে। তাছাড়া, দলে আমিই একমাত্র মেয়ে বলে সকলেরই তীক্ষ্ণ নজর আমার উপর আছে। তাই আমার পক্ষে পথে কোন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

তারপর—যা সব মেয়েদেরই মনে হয়,—যা হোক্ বাবা, ওরা ঠিকমতন চলুক তো। আমার যা হয় হবে! উনি নিজের লাঠিটা দাদাকে দিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে কাছে দিলীপ প্রায় সর্বদাই থাকে। ওর হাতে অবশিষ্ট Ice-axe খানা। আমার হাত এখন দিলীপের শক্ত হাতের মুঠোয়। তবু পায়ে জোর পাচ্ছি না কিছুতেই, টলে টলে পড়ে যাচ্ছি। উৎরাই-এর পথে বীর সিং মাঝে মাঝে সাহায্য করতে ছুটে আসছে।

দুটি একটি বড় বড় পাথরের স্তূপ পার হয়ে আমরা শুভ্র-হিমবাহের ময়দানে চলতে শুরু করেছি। পদে পদে পা পিছলে যাচ্ছে। দুপুরের রৌদ্রে ঝলমল করছে চারিদিকের শুভ্র তুষার প্রান্তর। পাহাড়ের চূড়াগুলি কেবল কুয়াশায় ঢাকা, অন্যত্র তুষার যেন জ্বলছে। আমরা কালো চশমা পরে নিয়েছি আজ, আজ আর ভুল হয়নি। চারিদিকের জ্বলন্ত দৃশ্য চোখ খুলে দেখতে আর কোন কষ্ট নেই।

বিশাল শুভ্র-তুষার ঢাকা প্রান্তর কিন্তু অগণ্য ফাটলে ভরা, অজস্র পাথর ছড়ানো। বড় বড় ফাটল এড়িয়ে চলবার পথ বেছে নিতে হচ্ছে। ছোট ফাটলগুলি ডিঙিয়ে চলতে হচ্ছে, প্রয়োজনবোধে লাফিয়ে পার হতে হচ্ছে। সরু সরু স্বচ্ছ জলধারা তুষারের মধ্যে নীলাভ-শুভ্র পথ তৈরী করে বয়ে চলেছে। দ্বিপ্রহরের সূর্যতাপে জলধারার সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তৃষ্ণার্ত হ'লে মাঝে মাঝে অঞ্জলি ভরে সুস্বাদু শীতল জলপান করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছি।

আমরা সতের হাজার ফুট ( ১৭,০০০ ফুট ) উঁচু তুষার প্রান্তর পার হয়ে এলাম। সম্মুখে এখন সুরালয় হিমবাহের তুষার স্রোত

দক্ষিণ দিক থেকে সুরালয় হিমবাহ নীচে নেমে এসে চতুরঙ্গী হিমবাহতে মিশেছে। আমাদের চলবার পথে, সম্মুখে সুরালয়ের হিমস্রোত একশো কি দেড়শো ফুট নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে। আগেই বলেছি তুষার স্রোতধারার একটি গতি আছে, কিন্তু খুব ধীরগতি, মনে হয় স্থির। তবু স্রোতধারা চোখে পড়লেই বেশ বোঝা যায় তার গতির অস্তিত্ব। হিমবাহ ও আমাদের পথের মাঝখানে বেশ বড় একটি খাদ। তার মধ্য দিয়ে একটি ঝরনা উন্মত্ত বেগে বয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ পথ!

স্বামীজী এগিয়ে এসেছেন, খাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দিলীপ সিং ও বীরসিংকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কোন্ পথে নামলে আমাদের পক্ষে চলা সহজ হবে। বালি-পাথরের সাথে আজ গলিত তুষার-স্তূপ মিশেছে, খাদে নামবার জন্য আছে খাড়া উৎরাই পথ। মনে মনে ভয় হচ্ছে? না তো! আমাদের পথ-প্রদর্শকেরা এতো যত্নের সঙ্গে সাহায্য করে নিয়ে চলেছেন, যে ওদের উপর আমাদের নির্ভরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

ওদের সাহায্য নিয়ে এক-পা এক-পা করে নেমে এসেছি বালি-পাথর ও তুষার মিশ্রিত ঝুরঝুরে পথ বেয়ে। বীরসিং দুটো বড় বড় পাথর বয়ে

পায়ের সামনে জলধারার মধ্যে রেখেছে। তারি উপর পা ফেলে খাদের জলও পার হয়েছি নির্বিঘ্নে। কিন্তু সাহায্য করতে এসে তড়বড়ে বীরসিং পা হড়কে গিয়েছিল। একটা টলায়মান পাথরে পা দিয়ে ও ভুল করেছে। কিন্তু খুব সামলে নিল। এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখছি। খাদটি পার হয়ে আমি একটা পাথরের উপর এসে বসেছি। সত্যেনবাবু ও দাদার পার হওয়া দেখছি। অতি সাবধানী সত্যেনবাবু হাঁটু মুড়ে নীচু হয়ে ধীরে ধীরে নামছেন দরকার হলে হাত-পা দুই-ই কাজে লাগাচ্ছেন। দাদা অনেকটা সহজভাবেই পার হতে পারলেন।

আমাদের চেয়ে দাদার পাহাড়ে চলার অভিজ্ঞতা শতগুণে বেশী। ত্রিশ বৎসরের উপর পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন উনি। ওঁর সাথে আমাদের পথ চলার তুলনা করাই চলে না। এমন কঠিন পথে, ওঁর অমূল্য সঙ্গ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছি। কিন্তু মেজর সাহেবকে বাহাদুরী দিই। এই ওঁর প্রথম পাহাড়ে চলা।

এবার স্বরালয় হিমবাহের শুভ্র তুষারের উপর দিয়ে চলেছি। এখানেও অজস্র ফাটল দিয়ে অসংখ্য জলধারা বয়ে চলেছে - দেখতে সুন্দর, কিন্তু চলবার পক্ষে বিপজ্জনক। নিষ্কলুষ শুভ্রতার উপর আমাদের চলার পথের রেখা এঁকে দিয়ে যাচ্ছি।

স্বরালয় পার হয়ে আবার চতুরঙ্গী হিমবাহের পাথর স্তূপের ছোট ছোট পাহাড়ের পথে চলা। একবার পাহাড়ের উপর উঠছি, আবার কষ্ট করে নামছি। উঃ! আর যে পারছি না। দূরে দেখছি, স্তরে স্তরে হিমবাহের পাহাড় ডিঙিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। পাথরের রাজ্যে দেখাচ্ছে যেন ক্ষুদে ক্ষুদে চলন্ত পাথর! কিন্তু, "আর কতো এগোবে ওরা? আজ কি আর থামবে না? কোথায় ক্যাম্প করবে ওরা আজ? কি বলেছেন স্বামীজী?"

অধৈর্য্য হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকি দিলীপ সিংকে।

সান্ত্বনার স্বরে দিলীপ বলে—"ধীরে ধীরে চলো বহিনজী, হামারি সাথ্ সাথ্ চলো। উ লোগ্ কা যানে দেও। হাম্‌লোগ্ ধীরে ধীরে চলকে উধর পহুঁছ যায়েগা। ঘাবড়াও মাৎ।"

স্বল্পভাষী দিলীপ, কিন্তু বড় করুণাভরা মন। সর্বদাই আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ নজর ওর। খুব ধীরে ধীরে, বিশ্রাম করতে করতে

এগিয়ে চলেছি। এইভাবে পাহাড়ের পর পাহাড় পার হতে থাকি ওদের পিছন পিছন।

সুরালয় পার হয়ে কুলিরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে আমাদের তাঁবু ফেলতে শুরু করেছে। দূর থেকে মনে হয় সচল পাথরগুলি কি কাজে যেন ব্যস্ত হয়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে পৌছাতে আরও তিন-চারিটি পাথর স্তূপের পাহাড় পার হতে হবে। শেষ স্তূপদুটির মাঝে টল্‌টলে সবুজ রং-এর বেশ বড় জলাশয়—glacial lake! তার চারিদিকে লালচে রং-এর পাথরের পাহাড় —অপরূপ রং-এর খেলা!

আমাদের আর চলবার অবস্থা মোটেই নেই! আমি ভেবেছি কেবল আমিই অনড়, অচল হয়ে পড়েছি! ওমা! বিশ পঁচিশ হাত দূরে দেখি সত্যেনবাবু আর দাদাও তেমনি ঢুলে ঢুলে চলেছেন! আরও দূরে একখানি পাহাড়ের মাঝখানের খাদের ব্যবধানে উনি চলেছেন, যেন ইচ্ছে নেই, কেবল সাধুজীর পাল্লায় পড়ে যেতে হচ্ছে! তবে সবারই এক অবস্থা!

আজ আমরা যখন Camp site-এ পৌছলাম, তখন আর কারুরই শক্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আমার অল্প কিছু আগেই সত্যেনবাবু পৌছেছেন অদ্ভুতভাবে হেসে বলছেন—ওরে মনি! বসতেও যে পারছি না, পা মুড়বারও শক্তি নেই যে!

দিলীপ সর্বদাই তার বহিনজীর বিশ্রামের জন্য তার নিজের শ্লিপিং ব্যাগটা পেতে দেয়। পৌছানোর সাথে সাথে তাই আমার শয্যা এখনই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ওঁরা সকলে নিজের নিজের বর্ষাতি পেতে শুয়ে পড়েছেন। কারুর মুখে আজ আর কথা নেই! আজকের মত এত শ্রান্ত এ পর্যন্ত কোনদিন আমরা হইনি। আশ্চর্য্য! আজ মাত্র ছয় ঘণ্টা পথ চলেছি। আজই প্রথম উচ্চতার জন্য বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বোধ করছি সকলে। তাই আমাদের এত কষ্ট, সহজেই এত শ্রান্তি বোধ!

নিজস্ব-সংবাদদাতা হরচাঁদ খবর দেয়—"ডকটর সাব, চার পাঁচ আদমীকো শির দরদ হুয়া, দাওয়াই মাংতা।"

তবে তাই, ওদেরও আমাদের মত উচ্চতার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। এখন শুনছি, কাল রাত থেকেই নাকি ওদের কয়েকজন বমি করছে, খেতে পারছে না, মাথা ধরেছে।

সর্বনাশ! শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে উঠতে হয়, ওষুধের ব্যাগ খুলে aspirin বের করে বিলোতে সুরু করে দিই। সঙ্গে সঙ্গে ওদের সবাইর জন্য ভিটামিন ট্যাবলেটও বের করে দিই। উপকার কতদূর হবে বলা শক্ত, তবে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবার জন্যে এমন পথের এমনি স্থানে, সরল পাহাড়ীদের পক্ষে অমোঘ দাওয়াই।

Aspirin! aspirin! শুনে শুনে, মেজর সাহেব বলছেন, তাঁরও মাথা টিপ টিপ করছে! আমারও তাই। মাথা ধরার ভয়ে ভয়েই যেন মাথাটা ধরে গেল। আমি তাই একটা বড়ি খেয়ে নিয়েছি। অধিকন্তু ন দোষায়। মেজর সাহেব অনেকক্ষণ তাল ঠোকাঠুকি করলেন এসপিরিন খাবেন কি খাবেন না, শেষে না খাওয়াটাই সাব্যস্ত করলেন। ডাক্তার মানুষ তাই ওষুধ খেতে বড় বেশী দ্বিধা।

কিন্তু আজ, এই যুদ্ধ-ফেরৎ মিলিটারী সাহেবের বেশ কষ্ট হয়েছে। হিমালয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করা ওঁর এই প্রথম। কিন্তু কষ্ট হলেও, তা মুখে স্বীকার যে মহা অসম্মানের কথা! সঙ্গে যে একজন অবলা স্ত্রীলোক রয়েছেন, তিনিও আবার হেঁটেই একসাথে চলেছেন! তাঁর কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করে মাথা হেঁট করা, ছি ছি! নৈব নৈব চ!

তাকিয়ে তাকিয়ে ওঁর দুর্দ্দশা দেখি আর মনে মনে হাসতে থাকি। তাঁর বন্ধুকে বলছেন, আমার আর কি! এই একবারই তো! নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার! কোনমতে ক'টা দিন তোদের পিছু পিছু চলে কাটিয়ে দিতে পারলেই হোল। গ্লেসিয়ার দেখবার সখ হয়েছিল, তা সেটা এই ফাঁকে হয়ে গেল। আর কি কখোনো আসবো? তোদের মতন বছর বছর আমি তো আর আসছি না!

হেসে উঠেছি আমরা। হাসছেন দাদাও।

উনি বলেন—"ওরে এখনো ওসব কথা বলবার সময় আসেনি। এখন কিছু বলিসনা। আসছে বছর দেখা যাবে, আর আসবি কি না। এখন তার জন্য মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? হিমালয়ে ঘুরে বেড়ানোর নেশার মত নেশা খুব কমই আছে। প্রতিবৎসর পাহাড়ে চলবার সময় আমরাও তোর মতন এই কথাই বলি। চলতে চলতে যখন কষ্ট হয়, তখন মনে মনে সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করি, আর জীবনে এমুখো হবো না। এই যে হোল, ব্যস, এই শেষ! বৎসরান্তে

আবার চিঠি লেখালেখি, গোছগাছ করা, টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসি। মনটা কেমন আনচান করতে থাকে। না এসে পারি না।

সহাস্য মুখে স্বল্পভাষী দাদা ঘাড় নেড়ে সায় দেন।

রোদ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় ঠাণ্ডা পড়েগেছে। শীতে সকলেরই কাঁপুনি ধরেছে। তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেও তো কাঁপুনি থামছে না। চা, চা চাই যে একটু!

সোনালী রংএর ফুটন্ত পানীয়,—ধোঁয়া উঠছে। আমাদের জন্য সবুজ, নীল, গোলাপী রঙের প্লাষ্টিকের কাপে চা ঢেলে দিচ্ছে বীরসিং, তার হাতের কেংলি থেকে। আমাদের সম্মুখে যেন অমৃতভাণ্ড ধরেছে, ও। দার্জ্জিলিং নেপাল সীমান্তের পাহাড়ের সুংমা চা বাগানের চায়ের মধ্যে প্রস্ফুটিত ফুলের সুবাস পাচ্ছি আমরা। স্বর্ণবর্ণ পাতার কুঁড়ি থেকে তৈরী করা সে অমৃত।

আমাদের মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হোল। কিন্তু এহেন অমৃতেও যেন কার অরুচি! ডাক্তারসাব! সুন্দরবনের মধু এনেছি, তাই দিয়ে গরমজল খাচ্ছেন! উনি চা খান না।

—"ডাক্তারসাব"—ভাঙা গলায় কে ডাকে?

ওমা! এ যে স্বামী সুন্দরানন্দজী!

উমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছেন। স্বামীজী করুণভাবে হাসছেন।

"হাম্‌কো লিয়ে ভি একঠো দাওয়াই দেনা! বরি দরদ, ঔর বুখার ভি হুয়া মালুম হোতা।"

চমকে উঠে উনি বলেন, "তবে আপনি কাল চলবেন কি করে?"

"কাল্ সব্ ঠিক হো যায়গা, কুছ হর্জ নেহি। এ্যায়সাই হোতা হায় হমকো। এ্যায়সাই চলা যায়গা হাম!"

সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেন এই ছোট্ট মানুষটি। কোথাও পথ কেটে, কোথাও হাত ধরে আমাদের সাথে সাথে নিয়ে চলা! দিনান্তেও বিশ্রাম নেই, সকলের জন্য রান্না করা। স্বামীজীর দেহের সহনশীলতারও তো একটা সীমা আছে। এখন দেহ তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

আমরা চুপচাপ পড়ে আছি। বাইরে প্রচণ্ড শীত, দেহের অসীম শ্রান্তির জন্য বাইরে বের হতে পারছি না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সূর্য্যের আবছা আলো

তুষারে প্রতিফলিত হয়ে এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি। ঘুরে ফিরে এদিকে ওদিকে করে আলোকিত রেখেছে পর্বতরাজ্য।

চোখ জড়িয়ে এসেছে ঘুমে।

কার চেঁচামেচিতে সুখতন্দ্রা ভেঙে যায়? কিন্তু কে কাকে ধমকাচ্ছে?

"নিকাল্ যাও, নিকাল্ যাও, হিঁয়াসে! কোই কাম্ কা নেই।" তারপর আর শোনা যায় না। কে যেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে, যেন লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে।

বাইরে মুখ বের করে দেখবার চেষ্টা করি। একি স্বামীজীর গলা? কিন্তু স্বামীজী কাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন? কে কাঁদছে?

দিলীপ এসেছে, তারও 'শির দরদ হুয়া।' দাওয়াই লাগবে। তার মুখে শোনা গেল, আজ অসুস্থ অশক্ত স্বামীজী ধৈর্য্য হারিয়েছেন। পট্টবর্দ্ধনকে তাঁর তাঁবু থেকে বের করে দিয়েছেন। সে নিজের মাল নিজে নিয়ে কষ্টকর পথ চলবার পর আর কোন কাজই করতে পারে না। তাঁবু খাটানো, রান্নার যোগাড় করা, কোন কাজেই সে হাত লাগায় না। এমনকি থালা বাসন ধোয়া পর্য্যন্ত স্বামীজীকে করতে হয়। আজ তাই অসুস্থ স্বামীজী ধৈর্য হারিয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

দরদী দিলীপের কণ্ঠে ব্যথার সুর বেজে উঠেছে। রোগা লম্বা দেহখানি দরদে যেন নুয়ে পড়েছে, কিন্তু অন্ধকারে তার মুখভাব দেখতে পাওয়া যায় না। গেলেও বিশেষ লাভ হোত না, জানি। ভাব লেশহীন সে মুখ গলার স্বরের সাথে সামঞ্জস্য-হীন।

"ক্যা করেগা বাবুজী, ইধর তো এ্যায়সাই হোতা হ্যায়! ইধর্ কা হাওয়া এ্যায়সাই হ্যায়! লেকিন সাধুজীকা মেজাজ তো ঠিক রাখ্না! কেয়া করেগা! উ' কেয়া করেগা!

স্বামীজী পট্টবর্দ্ধনকে তাঁর তাঁবু থেকে বের করে দিয়েছেন, ছুঁড়ে ছুঁড়ে পট্টবর্দ্ধনের জিনিস পত্র বাইরে ফেলে দিচ্ছেন। তার সাথে গালাগালি জুড়েছেন।

তাঁবুর বাইরে প্রচণ্ড শীতে পাথরের উপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পট্টবর্দ্ধন কেঁদেই চলেছে। দিলীপ ও হরচাঁদ তার মালপত্রগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তাদের নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেল। এখন হাত ধরে পট্টবর্দ্ধনকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো তাদের তাঁবুর মধ্যে। আমরা নীরব দর্শক, নীরব শ্রোতাও!

ভাবি, কি কঠিন পথ! এমন শক্তিমান পট্টবর্দ্ধন, যে স্বামীজীর সাথে ভারি বোঝা বয়েও একত্র চলবার সামর্থ্য রাখে, সে কেন আজ অচল হয়ে পড়েছে? অসহায় শিশুর মত ফুলে ফুলে কাঁদছে আজ?

আর স্বামীজী?

পাঁচবার এপথে আসা যাওয়া করেছেন। পর্বতে, প্রান্তরে যাঁর একইরূপ স্বচ্ছন্দগতি, তিনি আজ ব্যতিব্যস্ত, বিপর্যস্ত। ধৈর্যবান্, শক্তিমান্ আজ শক্তিহীন ধৈর্যহীন হয়েছেন। শক্তির দম্ভ আজ ভূ-লুন্ঠিত!

সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা এখানে ( ১৭,৫০০ ফুট ) সাড়ে সতের হাজার ফুটের কম নয়। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তো নেই আমাদের সাথে, যে সঠিক উচ্চতা বলা সম্ভব হবে? স্বামীজী, দিলীপ এরা আগে এ পথে পর্বতারোহীদের সাথেও এসেছেন, ওঁরা এই কথাই বলছেন।

এত উচ্চতার জন্য আমাদের প্রাণবায়ু অক্সিজেন কমে এসেছে। অক্সিজেনের অভাবে যে এমন প্রতিক্রিয়া হবে, আমাদের যেন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাছাড়া আমাদের প্রতিকার করবারই বা কি শক্তি আছে?

কাল অমাবস্যা গেছে। রাত্রির কালো আঁধার নেমে আসছে ধরার উপর। ওই মূর্খ, অসভ্য, দরিদ্র পাহাড়ীদের প্রশস্ত হৃদয়ের কাছে সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত আমাদের শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য আজ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে! আমাদের এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি আজ শক্তিমানের সরলতার নিকট পরাজয় মেনে নিয়েছে। আমরা কিছুই করতে পারলাম না, অসহায় পট্টবর্দ্ধনের জন্য। আর অবলীলাক্রমে বিনা দ্বিধায় সেই সাহায্য দিলে দিলীপ, হরচাঁদ! কিন্তু এ পরাজয়ে আমরা খুসী হয়েছি। হৃদয়বান্, শক্তিমানের সহায়তা পেয়েছি আমরা! আমরা আজ পরম নিশ্চিন্ত।

ছ'টা নাগাদ বীরসিংহ খিচুড়ি রেঁধে নিয়ে এলো। মুখে দিয়ে দেখি, তার ডালগুলি সামান্য নরম হয়েছে বটে, চালগুলি একেবারেই আস্ত ও শক্ত। শরীরটা যেন অসম্ভব দুর্বল বোধ হচ্ছে এবার! হায়রে! একবেলার খাওয়া, তাও এই জুটলো!

উপায় কি? ওই-ই চিবোচ্ছি।

"কি রেঁধেছ বীরসিংহ? একেবারে যে সেদ্ধ হয়নি!" লজ্জায় বীরসিং পালিয়ে গেছে।

হাতে করে দুখানা চাপাটি নিয়ে এলো, তার নিজের জন্যে তৈরী করা। বললে "দু'ঘণ্টা ফুটিয়েও চাল সিদ্ধ হোল না, কি করবো মাইজী ?"

আমাদেরই ভুল হয়েছে। আজ সকলের জন্য চাপাটির ব্যবস্থা করতে বলাই উচিত ছিল। কিন্তু, আজ যে সকলেরই দেহের অবস্থা সঙ্গীন। বিচার বুদ্ধি সকলেরই লোপ পেয়েছে বুঝি !

গঙ্গোত্রী ছাড়বার পর এ পর্যন্ত কোনদিন দুবেলা পুরো খাওয়া জোটেনি। ওই একবার মাত্র বিকাল বা সন্ধ্যায়। কিন্তু সমস্ত দিন ধরে বিস্কুট, চিজ্, বাদাম, চকোলেট ইত্যাদি খেতে খেতে এসেছি।

দিলীপ আবার এসেছে। "ঔর চার আদমীকা শিরদরদ হুয়া, দাওয়াই মাংতা। উল্‌টি কা ভি দাওয়াই।"

প্রায় সব পাহাড়ীরাই আজ "শির-দরদে" কষ্ট পাচ্ছে। কারু কারু 'উলটি' অর্থাৎ বমিও হচ্ছে।

বাইরে মিশ্‌মিশে কালো আঁধার নেমে এসেছে ধরার উপর। শুভ্র প্রান্তর থেকে আর আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে না। রাত্রি তাঁর কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সবাইকে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত সবাই সেই আঁধারের কোলে বিশ্রামের জন্য ঢলে পড়েছি।

# গঙ্গোত্রী হিমবাহরাজ্য পরিক্রমার ইতিকথা

আমরা গঙ্গোত্রী হিমবাহ রাজ্যে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। এই রাজ্য সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত পর্বতারোহণের ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় এই হিমবাহ অঞ্চলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আসেন Birnie. ১৯৩১ সালে Frank Smythe এর নেতৃত্বে Eric Shipton, R. L. Holdsworth, E. S. J Birnie, C. R. Greene, Lewa, Keshar Singh প্রভৃতি কামেটশৃঙ্গ আরোহন করেন এবং অবসর সময়ে চারিদিক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেন। সেই সময় এই অঞ্চলের কোন ম্যাপ ছিল না। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, বদ্রীনারায়ণ থেকে কোন একটি গিরিপথ দিয়ে তাঁরা গঙ্গোত্রী হিমবাহে পৌছাতে পারবেন। তদনুসারে তাঁরা এক এক জন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং এক একটি অঞ্চল ঘুরে ঘুরে পর্য্যবেক্ষণ করেন। এইভাবে Birnie একটি গিরিপথ আবিষ্কার করে চতুরঙ্গী হিমবাহে পৌছাতে সক্ষম হন। এই গিরিপথ Birnie pass নামে বিখ্যাত হয়। চতুরঙ্গী ধরে এগিয়ে তিনি গঙ্গোত্রী হিমবাহে পৌছান। আর অধিক অগ্রসর না হয়ে তিনি অরোয়া নদীর উপত্যকা ধরে বদরীনারায়ণ ফিরে আসেন।

এখানে প্রশ্ন জাগে মনে, যে Birnie pass ও কালিন্দী খাল(pass) কি এক? Frank Smythe এর লেখা Kamet conquered বই এর ম্যাপ থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয়, দুটি pass এক নয়। স্বামীজীর মতও এই মতেরই সমর্থক। পরবর্ত্তী কালে লেখা কোন কোন map ও বইতে যদিও এক বলে উল্লেখ দেখা যায়! পথ চলতে চলতে সুন্দরালয় থেকে চতুরঙ্গীতে নেমে আসা হিমবাহের এক স্থানে স্বামীজী দাঁড়িয়ে Brinie pass এর কথা বলেন। আমাদের চলার পথের দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলেন, ওই হোল Brinie pass! একবার তিনি ভুলক্রমে ওইপথে গিয়েছিলেন ওই হোল কালিন্দী খাল pass পরে সে ভুল সংশোধন করে নেন, কারণ ঐ পথ কালিন্দী খালের তুলনায় অনেক বিপদসঙ্কুল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Eric Shipton ও H. W. Tilman নন্দাদেবী পর্বতমালা পরীক্ষা করা ও আরোহন করবার চেষ্টায় ধৌলী উপত্যকায় যান। কিছুদিন সেই অঞ্চলে ঘুরবার পর ২৩শে জুন যখন বৃষ্টি সুরু হোল, তাঁরা যোশীমঠে ফিরে এলেন। এক সপ্তাহ পরে তাঁরা অলকানন্দার উপত্যকা ধরে ভাগীরথী খড়্গা হিমবাহ যাবার পথ আবিষ্কার করেন। এই হিমবাহ বদরীনাথের উত্তরে অবস্থিত। তাঁরা আশা করেছিলেন এখান থেকেই কোন গিরিপথ দিয়ে তাঁরা গঙ্গোত্রী হিমবাহে যেতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা অকৃতকার্য হন। তাঁরা অরোয়া নদীর উপত্যকা ধরে আরও অগ্রসর হয়ে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে Birnie যে পথে গিয়েছিলেন, সেই পথে Birnie pass অতিক্রম করে চতুরঙ্গী হিমবাহে পৌছান, এবং চতুরঙ্গী ধরে এগিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সঙ্গমে পৌছান। এই সময়টিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, বিশেষ করে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ অঞ্চলে। তবে অরোয়া উপত্যকা ও চতুরঙ্গী হিমবাহ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কিছু কম ছিল। এঁদের সঙ্গে ছিল, দার্জিলিং এর শেরপা দল। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে Tiger-badge প্রাপ্ত Ang Tharke-কে Tilman ও Shipton অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকের নিমিত্ত হিমালয়-অঞ্চলে জরিপকাজ বন্ধ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বভাবতঃই হিমালয় অঞ্চল ভ্রমণও বন্ধ থাকে কিন্তু যুদ্ধের পর বৃহৎ হিমালয়কে আবার ভালোভাবে জরিপ করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একটি প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষকের দল Marco Pallis এর নেতৃত্বে F. E. Hicks, C. F. Kiskus, R. C. Nicholson ও Dr. Charles Warren ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গোত্রী হিমবাহের নীচের দিকে আট মাইল পর্য্যন্ত এবং চতুরঙ্গী, রক্তবর্ণ, গঙ্গোত্রী এই হিমবাহগুলি জরিপ করবার জন্য কুড়ি হাজার ( ২০,০০০ ) ফুট পর্য্যন্ত আরোহন করেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ও ১৯৩৬ সালে বিস্তৃত জরীপের কাজ ভারতীয় সার্ভের দল Major Gordon Osmaston-এর অধীনে করে। ১৯৩৮ সালের মধ্যে হিমালয়ের পশ্চিমদিকে শতদ্রু নদীর উপত্যকা থেকে পূর্বে নেপালের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে তিব্বতের সীমানা নিখুঁতভাবে জরিপ করা শেষ হ'ল।

সেই সময় কুমায়ুনের গঙ্গোত্রী-হিমবাহ সহ ভাগীরথীর উপত্যকা এবং তার চারিদিকে পর্বতশৃঙ্গগুলি শ্রীকণ্ঠ, জাওনলী, কেদারনাথ, সতপন্থ, চৌখাম্বা এবং যে সব হিমবাহ থেকে অলকানন্দার জল সরবরাহ হয়, কামেট পর্বতমালা ও ধৌলীর পর্বতাঞ্চলের উপনদী সকল, নন্দাদেবী পর্বতমালা ও তাঁহাদের উপত্যকা সমূহ, আলমোড়া জেলা ও পঞ্চচুল্লী পর্বতশৃঙ্গ সকল, সবই এই সময় জরিপ করা হয়ে যায়। এই অঞ্চলের বহু অংশ অনধিগম্য ও অজানা ছিল। বিশেষ করে এই সময় তিব্বতের সীমানার কাছে কয়েকটি হিমবাহ আবিষ্কৃত হয়।

Osmaston-এর দলে ছিল দুইজন সার্ভেয়ার, পঞ্চাশজন গাড়োয়ালী খালাসী এবং একশ' কুড়িজন স্থানীয় কুলি। এদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন, কাজ ছিল, দুর্গম গঙ্গোত্রী-হিমবাহের উপর উঠে অন্ততঃ দুটি কেন্দ্র স্থা'ন করা, যাতে সার্ভেয়ারগণ সমস্ত অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে জরিপ করতে পারেন। কয়েকবার জরিপ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ঐ অঞ্চলের যে বিবরণ ইতিপূর্বে সংগৃহীত হয়েছে, তা অনেকাংশে ভুল।

Osmaston এর দল এই জরিপ করবার সময় এই অঞ্চলে কয়েকটি দুর্ঘটনার হাত থেকে খুব অল্পের জন্য রেহাই পায়। ফজল ইলাহী ছিলেন একজন ঝানু পর্বতারোহী সার্ভেয়ার। তিনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গোত্রী হিমবায়ের উৎপত্তির দিকে বর্ষার প্রথমে তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েন। কয়েকদিন তিনি সম্পূর্ণরূপে তুষারে আটক পড়ে থাকেন। প্রায় পনের মাইল দূরে গোমুখ থেকে তাঁর রসদ সরবরাহকারী কুলিরা তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে অসমর্থ হয়। যখন তাঁর খাদ্য ও জ্বালানী শেষ হয়ে গেল, তখন বাধ্য হয়ে তিনি তাঁবু পরিত্যাগ করে চারজন খালাসী সহ মাত্র দুটী করে কম্বল সম্বল করে কোমর পর্যন্ত গভীর তুষারের ভিতর দিয়ে চলা সুরু করলেন। প্রথম রাত্রি তাঁরা উপবাস করে একত্র জড়াজড়ি করে বসে থেকে রাত কাটালেন। পরদিন, চলবার সময় হালকা হবার জন্য একখানা করে কম্বল তাঁরা ফেলে দিলেন। গভীর তুষারের মধ্য দিয়ে তাঁরা আরও তিন মাইল এগোলেন। দ্বিতীয় রাত্রি প্রভাতে ফজল-ইলাহী তাঁদের শেষ কম্বলখানিও পরিত্যাগ করে অশেষ কষ্টের মধ্য দিয়ে দলকে নিয়ে চললেন। সন্ধ্যার দিকে তারা সম্পূর্ণ অচল ও অসমর্থ হয়ে পড়লেন কিন্তু তখনো গোমুখ

পৌছানো গেল না। ইতিমধ্যে গোমুখ থেকেও একটি দল তাঁদের খুঁজতে বেরিয়েছিল। এরা সেই সময় ফজল ইলাহীর সাক্ষাৎ পায়। এত কষ্ট সত্ত্বেও ফজল-ইলাহী এবং একজন খালাসী নিজেদের পায়ের উপর ভর করেই তাঁবুতে পৌছাতে সমর্থ হলেন, কিন্তু অন্যরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাদের বহন করে আনতে হোল। এরা সকলেই খুব বেশী রকমভাবে তুষারক্ষতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের জুতো কেটে কেটে খুলতে হয়েছিল।

জরিপ করার কালে এরা কয়েকটি নতুন গিরিপথ অতিক্রম করেন। একটি হোল গুপ্ত-খাল গিরিপথ (১৮,৯৯০ ফুট)। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে Mumm অলকনন্দার উৎপত্তিস্থলে বাণকুণ্ড-হিমবাহতে এটির অস্তিত্ব সন্দেহ করেছিলেন। তদনুসারে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে Frank Smythe এটির খোঁজ করেন, কিন্তু সন্ধান পান না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে R. C. A. Edge ও R. Gardenar এই গিরিপথ অতিক্রম করেন। কিছুদিন পর ঐ সালে মানা শৃঙ্গ আরোহণের সময় Smythe ও Oliver এই গিরিপথ অতিক্রম করেন। এটি মানার দুই মাইল উত্তর-পূবে অবস্থিত।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে Prof. R. Schwarzgruber এর নেতৃত্বে একটি অষ্ট্রো-জার্মান দলের জন্য এই হিমাঞ্চল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এই দলে ছিলেন চারজন পর্বতারোহী ও একজন ডাক্তার, নাম Rudlof Jones. সৌভাগ্যক্রমে এরা রওনা হবার পূর্বেই Osmaston-এর জরিপের প্রথম নক্শা হাতে পেলেন, তাতে তাঁদের চলতে খুব সুবিধা হোল। যতদূর জানা যায়, তাঁদের দলে ছয়জন শের্‌পাও ছিলেন বর্ষার পরের সময়টি তাঁরা বেছে নিয়ে, বর্ষা শেষে হতে হতেই বেরিয়ে পড়েন। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত আসতে তাঁদের কোন অসুবিধাই হয়নি।

তাঁরা গোমুখ পার হয়ে নন্দনবনে (১৪,২৩০ ফুট) তাঁদের বেস্‌ ক্যাম্প স্থাপনা করেন। এটি চতুরঙ্গী হিমবাহ ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গমে অবস্থিত। তাঁরা ভাগীরথী (২১,৩৬৪ ফুট) শৃঙ্গ আরোহণ করেন ৯ই·সেপ্টেম্বর; চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩) ১১ই সেপ্টেম্বর; মন্দানী পর্বত (২০,৩২০ ফুট) ২০শে সেপ্টেম্বর; স্বচ্ছন্দ (২২,০৫০ ফুট) ২৩ সেপ্টেম্বর ও শ্রীকৈলাশ (২২,৭৪২ ফুট) ১৬ই অক্টোবর।

এই দল উত্তরদিক থেকে সত্‌পন্থ্‌ (২৩,২১৩ ফুট) শৃঙ্গের প্রাথমিক

পরীক্ষা শেষ করেন। কিন্তু উত্তরপূর্ব ও উত্তরপশ্চিম গিরিশিরা ধরে চেষ্টা করেও ঐ শৃঙ্গে আরোহণ করতে অসমর্থ হন। তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, একটি চার পাঁচ জনের দল বর্ষার পূর্বে এসে যদি উত্তরপূর্ব গিরিশিরা ধরে চেষ্টা করেন, তবে সতপন্থ্ আরোহণ করা সম্ভব হবে।

বদরীনাথ থেকে যে শিখরগুলি দেখা যায়, সেই চৌখাম্বা (২৩,৪২০ ফুট), প্রভৃতি পর্বত শৃঙ্গ আরোহণ করবার জন্য গঙ্গোত্রীর দিক থেকে প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ এই শিখর থেকেই সুরু হয়েছে। এই দল মত প্রকাশ করেন যে এদিক থেকে এটি আরোহণ করা অসম্ভব। তাঁরা তখন Birnie গিরিপথ অতিক্রম করে অরোয়া উপত্যকা থেকে ভাগীরথী খড়্গা হিমবাহে পৌছান। এখান থেকে তাঁরা যখন উত্তরপূর্ব গিরিশিরা ধরে ১৯,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠেছিলেন। একটি হিমানী সম্প্রপাত তাদের পথে পড়বার জন্য আর এগোবার চেষ্টা ছেড়ে দেন। এরপর তাঁরা পূর্বদিক দিয়ে আবার শৃঙ্গটি আরোহণের চেষ্টা করেন, সে পথও তাদের অসম্ভব বলেই মনে হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে J. T. M. Gibson একদল পর্বতারোহী যুবক নিয়ে প্রথম বন্দরপুছ-শিখর আরোহণ করেন। আমরা হবশিল, ধবালীর পথে এই শিখরটি দেখতে দেখতে চলেছি। যমুনা নদী বন্দরপুছ্ শিখর থেকেই বের হয়েছে।

গঙ্গোত্রী-হিমবাহ ও তার উপ-হিমবাহ চতুরঙ্গীর ধার ঘেঁসে যে পর্বতমালা আছে, সে সব Osmaston-এর দল ভালোভাবে জরিপ করেছিলেন। বৃটিশ রাজত্বের শেষভাগে এই অঞ্চলে একটি Swiss দল পর্বতারোহণ করতে যান। সেটা ছিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। দলে ছিলেন মাদাম লোহ্নার, আঁদ্রে রশ্, আলফ্রেড্ স্তার, রেণে ডিটার্ট ও আলেকজান্দ্রা গ্রাভেন। এঁরা ইয়োরোপ থেকে মে মাসে উড়ে আসেন এবং ১১ই জুন নন্দনবনে বেসক্যাম্প স্থাপন করেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন দার্জ্জিলিং-এর আটজন শেরপা মালবাহক। দলটি খুব শক্তিশালী ও অভিজ্ঞলোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

এঁরাই সর্বপ্রথম কেদারনাথ পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করেন। কীর্ত্তি-হিমবাহের সুরু হয়েছে কেদারনাথ শিখর থেকে। আমরা কীর্ত্তি-হিমবাহ ও কেদারনথে শিখর নন্দনবন থেকে ভালোভাবে দেখেছিলাম।

এই অভিযান একটি গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ২৫শে জুন এই দলটি যখন উত্তরপূর্বে White Dome (২২,৪১০ ফুট) শিখর ও কেদারনাথ শিখরের মধ্যবর্তী একটি তুষারের গিরিশিরা ধরে চলছিল, ওয়াংদি নরবু পিছলে পড়ে যান। তিনি তিনটি দড়িতে বাঁধা দলের শেষ দলে ছিলেন। তাঁর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে Sutterও পড়ে যান। দুজনে প্রায় সাতশো ফুট নীচে তলিয়ে যান। অন্য পাঁচজনা Roch, Graven, Dittert, Ang Dawa ও Ang Norbu অনেক কষ্টে নেমে তাঁদের কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হন। Sutter খুব অল্প আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াংদির বাঁ পায়ের গাঁট ভেঙে যায়, ডান হাঁটুতে চোট লাগে এবং মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তাঁকে নিয়ে আশ্রয়ে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। বাধা হয়ে তাঁরা একটা ফাটলের ভিতর আশ্রয় নেন। পরদিন প্রত্যূষে ওয়াংদিকে সেখানে রেখে সকলে সাহায্যের জন্য নেমে আসেন কিন্তু উদ্ধারকারী দল তাঁকে সেদিন খুঁজেই পেল না। ফলে সেই রাত্রিও তাঁকে উন্মুক্ত আকাশতলে কাটাতে হ'ল। পরদিন তাঁকে তারা খুঁজে নিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখল। পরে তাঁকে দেরাদুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, সেখানে আশ্চর্যভাবে তিনি বেঁচেও ওঠেন।

ওয়াংদি নরবুর তখন ৪০ বৎসর বয়স। এই তাঁর শেষ অভিযান। এর আগে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় প্রতিবৎসরই তিনি কোনও না কোনো অভিযানে যোগ দিয়েছেন। তিনি ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ১৯৩১ সালে কামেট, ১৯৩৪ সালে নাঙ্গা পর্বত, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮-এ এভারেষ্ট, ১৯৩৭-এ Smythe-এর সহিত গাড়োয়ালে, ১৯৩৮এ Schwarzgruber-এর সহিত গঙ্গোত্রী-হিমবাহে ও ১৯৩৯ সালে Tilman-এর সঙ্গে আসামের অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই দুর্ঘটনা দলের মনোবল ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাঁরা আবার জুলাই মাসে সমবেত হন, এবং ১১ই জুলাই Roch, Dittert, Graven, Sutter ও Tenzing কেদারনাথ শিখর আরোহণ করেন। এই অভিযানের সাফল্যেই Tenzing বিখ্যাত Tiger badge-এ ভূষিত হন। তিনিই ১৯৫৩ সালে Hillary'র সহিত এভারেষ্টের চূড়ায় প্রথম মানবীয় পদক্ষেপের গৌরব লাভ করেন।

কেদারনাথ-শৃঙ্গ আরোহণ করে তারা ১লা আগষ্ট সতপন্থ (২৩,২১৩ ফুট) শিখর আরোহণ করেন এবং কালিন্দীখাল গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে অরোয়া উপত্যকা ধরে বদরীনাথ ও অলকনন্দার উপত্যকা ধরে যোশীমঠ পৌছালেন। সেখান থেকে তাঁরা কুঁয়ারীপাস পার হয়ে "সুতোল" পৌছান। মন্দাকিনী উপত্যকার শেষ গ্রাম এই 'সুতোল। নন্দাঘুন্টি ( ২০,৭০০ ফুট )-তে তারা তারপর আরোহণ করেন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ছোট একটি দল গঙ্গোত্রী শিখরাবলী দেখতে আসেন। তাদের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক। তাদের সঙ্গে চারজন শেরপা ছিলেন, তারা গঙ্গোত্রী I ( ২১,৮৯০ ফুট ) ও গঙ্গোত্রী III ( ২১,৫৭৮ ফুট ) আরোহণ করতে সমর্থ হন।

সেই বৎসরই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে V. Russenberger ও L. Georges একটি ফরাসী দলের সঙ্গে এসে চৌখাম্বা ( ২৩,৪২০ ফুট ) শিখর আরোহণ করেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহের উৎপত্তি এই চৌখাম্বা শিখর থেকে।

## সীতা হিমবাহ—কালিন্দী-হিমবাহ—কালিন্দী-খড়্গ হিমবাহ

২২শে জুলাই : ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কাল রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ করেছি সকলে। আমরা রাত কাটিয়েছি চতুরঙ্গী হিমবাহের উচ্চতম প্রান্তে। এখানকার উচ্চতা ১৭,৫০০ ফুট।

কারুরই ঘুম ভালো হয়নি ; সে কিন্তু আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভারাক্রান্ত মনের জন্য নয়। প্রচণ্ড শীত, তাই দেহের সাথে সাথে আমাদের মনও যেন অবশ হয়ে এসেছে। সুখ-দুঃখ কোনটাই সহজে যেন কোন ছাপ ফেলতে পারে না তার উপর। কিন্তু, রাত্রিতে কখন থেকে জানিনা, তুষারপাত সুরু হয়েছিল, সমস্ত রাত তুষারপাত হয়েছে। প্রত্যুষের আলো ফুটবার আগেই জেগে গেছি, মনে হচ্ছে যেন দম আটকে আসছে। নাকের ডগায় কি যেন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে হাত বের করে সেটা সরাবার চেষ্টা করি। ওরে বাপস্! কি ঠাণ্ডা! তুষার জমে তাঁবু নাকের উপর ঝুলছে, নাক যে জমে গেল! ভালো করে নাকটা ঢেকে দিই।

তাঁবুর ভিতর থেকেই খোঁচা দিয়ে দিয়ে কয়েকবার উপরের তুষার রাত্রিতে ফেলে দিয়েছেন উনি। ভোরবেলা, ওরা কেউ বাইরে থেকে Ice-axe দিয়ে তাঁবুর উপরে তুষার পরিষ্কার করছে। শুয়ে শুয়েই আওয়াজে বুঝতে পারলাম।

মেজর সাহেবের গলা পাচ্ছি। বাইরে বেরিয়ে কিচির মিচির করছেন। তার সাথে সাথে দাদার ভারি কণ্ঠস্বর মিশেছে।

"ওরে বাবারে! কি ঠাণ্ডারে! হাত-টাত সব জমে গেলরে!" মেজর সাহেবের গলা! সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, মিলিটারী ভঙ্গিতে তিনি মাটীতে পা ঠুকছেন। আশা, হয়তো তাতে একটু গরম হতে পারবেন।

"ও মনি! বাইরে বেরিয়ে দেখ একবার! না হয় তাঁবুর ভিতর থেকেই মুখ বের করে একবার বাইরেটা দেখ, চারিদিক যে একেবারে সাদা হয়ে

গেছে।" দাদার স্নেহের আহ্বান কানে আসে। কিন্তু ওদের তেজ ঠাণ্ডা হতে বেশী দেরী হয় না। একটু বাদেই কণ্ঠস্বর শুদ্ধ হয়ে যায়। দুজনেই আবার তাঁবুর ভিতর ঢুকছেন!

মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কত কি দেখবো বলে এলাম এখানে, এতদূরে এত কষ্ট স্বীকার করে, আর যে অলৌকিক সৌন্দর্য এখন আমার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে, তা না দেখে চোখ বুজে পড়ে রইলাম তাঁবুর মধ্যে! এইতো, এ জায়গা ছেড়ে একটু পরেই তো চলে যেতে হবে, আর জীবনে কখনো এখানে আসবো না, যা অনাস্বাদিত ছিল, তা তেমনিই থেকে যাবে। নাঃ, তা কখনোই হতে পারে না।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে গরম পোষাকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে বীর নারীর মত বাইরে বেরিয়ে এসেছি!

তুষার! তুষার! তুষার!

কে যেন সারারাত ধরে তুষার ছড়িয়ে চারিদিক শুভ্র করে দিয়েছে। আমাদের আঘাত পাওয়া কালো মনটা আলো করে দিতে চেয়েছে; মুছে দিতে চেয়েছে অক্ষম পট্টবর্দ্ধনের চোখের জল, শান্ত করে দিতে চেয়েছে স্বামীজীর অসহায় ক্রোধ! সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসছে অদূরে চন্দ্র-পর্বতের শুভ্র-শিখর।

আকাশের গায়ে যেসব ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছিল, পাহাড়ের গায়ে ছিল ঘন কুয়াশা, সব এক জোট হয়ে জমাট বেঁধে ধরণীর উপর শুভ্র আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। নির্মেঘ ঘননীল আকাশ আমাদের মাথার উপর ঝক্‌ঝকে পরিচ্ছন্ন চন্দ্রাতপের মত ঢেকে রেখেছে। তার গায়ে সারি সারি তুষারপর্বত শিখর রাজি—চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩ ফুট), শতপন্থ-শিখর (২৩,২১৩ ফুট), বাসুকি শিখর (২২,২৮৫ ফুট)।

চারিদিকের হিমবাহের স্তরে স্তরে পাথরস্তূপের সাথে পাহাড়, আমাদের তাঁবু, তার পাশে প্লাষ্টিক-ঢাকা মালপত্র সব তুষারের আবরণে একাকার হয়ে গেছে। চন্দ্রপর্বত-শিখরের উপর থেকে হিমস্রোত আমাদের পায়ের নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। আধখানা পূর্ণচন্দ্র নীলাকাশে ভেসে রয়েছে যেন! হাস্যমুখে শশধর ধরায় নেমে আমাদের উপর তার সিত হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন!

কিন্তু সৌন্দর্য উপভোগের এই বিহ্বলতা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হল। শিহরণ জেগে ওঠে দেহে।

সত্যই! শিহরণ এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে "বাপরে কি শীত!" বলে "বীরনারী" আবার তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ি!

"স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড় শিগগির। নীল হয়ে গেছ যে।" সস্নেহ কণ্ঠে বলেন আমার স্বামী। চুপচাপ স-পরিচ্ছদ স্লিপিং-ব্যাগে আবার ঢুকে পড়ি! বেশ কিছুক্ষণ পরে শুনি, "বাবুজী গরম-পানি। মাইজী কা ওয়াস্তে ভি লায়া। মু ধোনে কা পানি। ঔর চা ভি বন্ রাহা হ্যায়।"

ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে পড়েছি। সকালে কি মধুর কথাই শোনালে বাবা বীরসিং!

রবির কিরণে চতুর্দিক ঝলমল করছে। চন্দ্রপর্বতের তুষার হেসে হেসে গড়িয়ে এসেছে আমাদের কাছ পর্যন্ত। হাসছে তার নীচে হিমবাহের উপরের হিমানী। আমাদের তাঁবু কেবল এখনো বিরস বদনে। পূর্বদিকের পর্বতের চূড়ার আড়ালে সূর্যদেব, আমাদের উপর এখনো কৃপা হয়নি তাঁর।

কিন্তু বীরসিং হাসছে।

উনি আরও জল চেয়েছেন, বলেছেন, এইটুকু জল এনেছো বীরসিং, ওতো তোমার মাইজীই নিয়ে নিলো। আমার জন্যে গরম না হোক্ ঠাণ্ডা জল দাও তো শুনে, হেসে উঠেছে বীরসিং।

"বাবুজী, সব পানি জম্ গিয়া। কোঁ হি ভি পানি নেহি হ্যায়।"

তাইতো! সবুজরঙা প্লাষ্টিকের বাল্‌তিতে কাল সন্ধ্যেবেলা বীরসিংই জল এনে রেখেছিল। ভোর বেলা মুখ ধোবার জন্য দরকার হবে আমাদের। সে জল জমে বরফ হয়ে গেছে। খাবার জল রাখবার বোতলের মধ্যে আধবোতল করে জল ছিল। ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে, হাসতে হাসতে বীরসিং বোতল নেড়ে দেখায়।

চন্দ্রপর্বতের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঝক্‌ঝকে সোনালী রোদ নেমে এসেছে এখন, আমাদের তাঁবু পর্যন্ত। আকাশের গায়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তুষার শৃঙ্গগুলি হেসে উঠেছে আমাদের দুরবস্থা দেখে—যেন বলছে, কে গো তোমরা? আমাদের তুষার রাজ্যের হালচাল জানো না? কি দেখছো অবাক হয়ে?

আমাদের জড়িয়ে জড়িয়ে সোনার বর্ণ অরুণালোক ঘিরে ধরেছে। উত্তাপের পরশ পেয়ে ধাতস্থ হতে পেরেছি। উত্তাপের পরশ পেয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে গঙ্গাসিং ওই, দেখ ওরা নাচতে সুরু করেছে। ওমা, ওর যে সিনেমাও তোলা হয়ে গেল।

সেজে গুজে তৈরী হয়ে বসে আছি। তাঁবু গুটানো হয়ে গেছে। পথ চলা সুরু করবো এখন। কেবল স্বামীজীর আদেশের অপেক্ষা।

"—বাবুজী, হাম্‌কো বাঁচাও আপ্‌লোক।"

বিত্রস্ত-বসনে, উস্কো খুস্ক মাথায়, পট্টবর্দ্ধন ছুটে এল, এসে, ওদের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছেন। বিব্রত হয়ে পড়েছেন উনি। তার হাত ধরে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন।

"বাবুজী, বোলো, তব্‌ হাম্‌ ইধর সেই ওয়াপস্‌ চলা যায়েঙ্গে, ক্যা করেগা, হাম্‌ ক্যা করেগা।"

পট্টবর্দ্ধন তার নিজের মালটুকু আর বইতে পারছে না। বাবুজীরা যদি ভরসা দেন আর কুলিদের বলে দেন, তবে ওরাই ওর মালটুকু বয়ে নিয়ে যাবে। নইলে তার আর উপায় নেই। ফিরে যেতে হবে তাকে।

হাওয়া চাই হাওয়া! হাল্‌কা হাওয়া, অক্সিজেনের অভাব রয়েছে তাতে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পট্টবর্দ্ধন, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, যৌবনের তেজে শক্তিমান লুটিয়ে পড়েছে, যথেষ্ট হাওয়া নেই তার বুকে। শ্বাস নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না তার দেহযন্ত্র।

আমাদেরই বা কি উপায় আছে? যারা আমাদের বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে কি কেউ বলতে পারে—ওহে তুমি আরও সের কয়েক মাল তুলে নাও তো? তারাও যে অশক্ত হয়ে পড়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওই হাওয়ার অভাবে।

পট্টবর্দ্ধন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে।

এপথে চলা, কেবল চলা নয়তো! এ যে জীবন মরণের মুখোমুখি দাঁড়ানো কোথায় বন্ধু! কে আছ, এমন বিপদে ত্রাণ করতে কে আছ?

বড্ড অসহায় দেখাচ্ছে ডাক্তার সাহেবের করুণাভরা মুখখানা। দণ্ডায়মান সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

কাজে ব্যস্ত ছিল দিলীপ, সাধুজীর তাঁবু গোটানোতে সাহায্য করছিল।

এ দিকে এতক্ষণে এসেছে। গোলমাল শুনে এগিয়ে এসেছে। কি হুআ আবার এখানে ? বিরক্তিতে কোঁচকানো মুখখানা আরও কুঁচকে ওঠে তার। খালি গোলমাল ! খালি গোলমাল !

"—ক্যা হুয়া ?"

ভ্রূ কুঁচকে এক লহমা দেখে নেয় চারিদিক। দেখে ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দনরত পট্টবর্দ্ধনকে। এক ঝটকায় তার বাহু ধরে টেনে তুলেছে।

"কাঁহে দিক্ করতা বাবুলোগকো ? চলো হামরা সাথ্ চলো। এক সাথ্ সব্ আদমী যব্ আয়া, একহি সাথ্ সব্ চলেঙ্গে।"

কতো সহজে সব মীমাংসা হয়ে গেল ! কে যে পট্টবর্দ্ধনের মাল বইলো কে জানে। কেবল একটা বোঁচ্কা দিলীপের ছোট স্লিপিং ব্যাগটার উপরে বাঁধা দেখলাম। আর দেখলাম, হরচাঁদ বসে বসে মাল খুলে নতুন করে ভাগাভাগি করছে। বোবা কালা ক্ষুদে ২ নং দিলীপ সিং তার বোঝার উপর একটি ছোট হলুদে রঙের থলে সামলে নিয়ে মাল বাঁধছে ! ভাইজীর হুকুম, জান দিয়েও তা মেনে নিতে হবে।

আমরা আর দেরী না করে চলতে শুরু করে দিয়েছি।

তুষার পতনের ফলে পাথরগুলি মাটীর সাথে এঁটে রয়েছে, নড়ে চড়ে কম, তাই পথচলাও সহজ হয়েছে খানিকটা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যালোক প্রখর হবার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলতে শুরু করেছে।

পৌনে ন'টায় রওনা হয়েছি। চলেছি তুষারের প্রান্তরের উপর দিয়ে। তেমনি চতুরঙ্গীর বিশাল ধব্ধবে তুষার প্রান্তর, চারিদিকে নানা আকারের পাথর ছড়ানো। দশটা নাগাদ আমরা সীতা হিমবাহের তীরে এসে পৌছলাম।

দক্ষিণ পূর্বদিক থেকে শুভ্রবরণ সীতা হিমবাহ এসে মিশেছে চতুরঙ্গী হিমবাহে। সীতা হিমবাহের নিষ্কলঙ্ক শুভ্ররূপ, দেখে মনে হয় এর নাম 'সিত হিমবাহ', কেবল উচ্চারণের ভঙ্গিতে 'সীতা-হিমবাহ' হয়েছে।

সীতা হিমবাহের সম্মুখে একটি বিপজ্জনক খাদ। পাথর বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে কঠিন পথটুকু পার হলেই সীতার তুষার প্রান্তর। এই হিম প্রান্তরের উপর দিয়ে চলা এখন। আমরা হিমরেখা ( snow-line ) পার হয়ে এসেছি অনেক আগেই। তাই এখনকার পথ কেবলই তুষারের উপর দিয়ে দিয়ে।

প্রান্তরের, তুষারের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে পাথরের ধার বেয়ে বেয়ে ছোট ছোট জলধারা তির্ তির করে বয়ে চলেছে।

বেশ লাগছে। কষ্ট বেশী নেই। নরম তুষারও নেই, বড় ফাটলও নেই। কিছুদূর এগিয়ে এই প্রান্তরেরই উপর পাথর ছড়ানো একটি ময়দানে আমরা বসে পড়েছি। বেলা সাড়ে এগারোটা বেজেছে। চা তৈরী হচ্ছে। আমরা এখন নাস্তা খেয়ে নেব। কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশনের দেবীদাস দত্ত আমাদের জন্য একটিন নকুল দানা দিয়েছিলেন, সেগুলি বের করেছি, হরচাঁদ হাসিমুখে সকলকে তাই ভাগ করে দিচ্ছে।

জ্যোতি সিং এর আনন্দ যে কিসে হয় তা বোঝা কঠিন। জ্ঞানানন্দ গান গাইছে—তা, ওতো সর্বদাই গান গাইবার তালেই থাকে- তার সাথে গলা মিলিয়ে সে-ও গাইছে। নাচ্ছেও সাথে সাথে। দূরে গিয়ে আমাদের নজর এড়িয়ে সে নাচ্ছে!

হরচাঁদ কিন্তু ওদের মধ্যে নেই। মালপত্র নামিয়ে রেখে এসেছে। এই সুযোগে তার বহিন্জীর খোঁজ করে গেল। ধবধবে ফর্সা মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি তার লেগেই আছে। একটি সোনা বাঁধানো দাঁত হাসির সাথে চিক্‌চিক্ করে ওঠে, নির্মল, শুভ্র নিষ্পাপ সে হাসি। যেন স্বর্গের সুষমা ঝরে পড়ছে!

"বহিন্‌জী! আভি তো সাথ্ সাথ্ রহ্‌নে নেহি সক্‌তা, কেয়া কর্‌না। ইধর্‌কা হাওয়া এইসা হ্যায় কি দম্ বিল্‌কুল্ ছুট্ যাতা"—কাছে বসে বসে আফশোষ করে সে।

চা খেয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করেছি। কিছুদূর চলে হঠাৎ স্বামীজী পিছন ফিরে পাশের দিকে তাকান। সাথে সাথে দেখাচ্ছেন—

"ওই দেখো অজন্তা—ইলোরা"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি—সর্বাঙ্গ নেচে ওঠে তাঁর।

থেমে পড়েছি সবাই। ফেলে আসা চতুরঙ্গীর তুষার প্রান্তরের শেষ প্রান্তে বিরাট তুষারের শুভ্র দেয়ালে পাশাপাশি মস্ত মস্ত এক জোড়া গুহা। হালকা সবুজ রঙের গহ্বর থেকে শুভ্র স্বচ্ছ জলস্রোত তীব্রবেগে নেমে আসছে। চতুরঙ্গীর তুষার প্রান্তরের পাথরস্তূপের সহিত সেই শুভ্র দেয়ালের শেষ প্রান্ত ভেঙে পড়ে এক ধ্বংসস্তূপের আকার ধারণ করেছে। তারই কোন ফাঁকে যেন ঢুকে এই জলধারা মিলিয়ে তলিয়ে গেছে। এই জলধারাই চতুরঙ্গী হিমবাহের

তুষারস্তূপের তলায় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে যাবে, মিলবে গঙ্গোত্রী হিমবাহের নীচের স্রোতধারার সাথে, তাদের সঙ্গমে। এখানে চতুরঙ্গী তার সর্বস্ব—তুষার, বালি পাথর শুদ্ধ জলধারা ঢেলে দিচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে। তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহের তুষার গলা স্রোত। এই মিলিত স্রোতকে আমরা আবার দেখতে পাবো, উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে সে নেচে নেচে হাসতে হাসতে গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ প্রান্তে—শিবলিঙ্গ শিখরের পায়ের তলায়,—ভাগীরথী শৃঙ্গাবলীর কোলের কাছ থেকে—গোমুখের চিরান্ধকার গহ্বর থেকে শিশু ভাগীরথী রূপে আত্ম প্রকাশ করবে।

একঘণ্টা বিশ্রামের পর চলতে শুরু করেছি। বেলা একটার মধ্যেই সীতা হিমবাহ পার হয়ে গিয়েছি। তুষার-স্তূপের উপর দিয়ে আবার উঁচু-নীচু পথে চলে চলে এবার আমরা কালিন্দী-হিমবাহের তীরে পৌছে গিয়েছি।

অকলঙ্ক শুভ্র হিমবাহের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু দাঁড়ালেই তো আর চলবে না, তুষার প্রান্তর ও হিমবাহের মাঝখানের ফাটলে যে স্বচ্ছতোয়া উদ্দাম নদীটি বয়ে চলেছে, সেটি পার হতে হবে। স্বামীজী চলেছেন আবার নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ নিয়ে—যেন কিছুই হয়নি! তাঁর জ্বরও হয়নি, তিনি ধৈর্য্যও হারাননি।

কালিন্দী হিমবাহ থেকে নেমে এসেছে নদী, নাম এর কালিন্দী নদী। এইটিই আসল কালিন্দী, স্বামীজী বলেন।

নীল যমুনার নামও কালিন্দী, সে বোধ করি এর কাছ থেকেই নাম, রূপ সবই ধার করে নিয়ে বড়লোক হয়েছে।

অপরূপ রূপসী, এর চলনে বলনে রূপের তরঙ্গ উছ্‌লে উঠেছে। কিন্তু ধীরা, স্থিরা নয় মোটেই, উদ্দাম, উচ্ছল এর গতি। এমন রূপ দেখলে ভয় হয়, শক্তিমানের হাতে শাণিত অস্ত্রের ঝলকানি যেন।

এ রূপ দেখবার কেউ নেই। এর তীরে দ্বাপর যুগে রাধাশ্যামের লীলা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। এখন কিন্তু এখানে বৃন্দাবন গড়বার স্বপ্নও কেউ দেখবে না।

খুব বিপদে পড়েছি আমরা। রাধা কালিন্দীতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চেয়েছিলেন আমরাও তো তাই চাই। এই "রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি"। ডুব দিয়ে ও রূপতরঙ্গে নিজেদের বিলীন করে

দিতে আমরাও চাই কিন্তু, কার্যকালে করছি ঠিক তার উলটো। কি করে জল স্পর্শ না করে কালিন্দী পার হবো তারই চেষ্টা চলেছে।

স্বামীজী তীর ধরে ধরে এগিয়ে চলেছেন। নদী পার হবার সুবিধা মতন স্থান পাওয়াটাই যে মুস্কিল। অনেক কষ্টে যে পথ পেলেন তার দুর্গমতা অবর্ণনীয়।

সম্মুখে দেখছি, হিমবাহের প্রান্তসীমার তুষারে বিরাট একটি গহ্বর। বিশাল নীলাভ গহ্বরের মধ্য থেকে কলরোলে, উদ্দামবেগে স্বচ্ছ জলধারা নিঃসৃত হয়ে আসছে। তার রূপে আতঙ্ক জেগে উঠেছে মনে। পাশের বালি-পাথর ও তুষার মেশানো তীরভূমি খাড়া নেমে এসেছে নদীর জল পর্যন্ত। আমরা তির্যক পথে নেমে এসেছি। নদীর উপর একটি স্থানে কয়েকটি বিরাট বিরাট পাথর পড়ে আছে, কোথাও সেগুলির ধার ঘেঁসে, কোথাও উপরে পা দিয়ে। কোথাও বা মাথা নীচু করে একটি ঝুলন্ত পাথরের তলা দিয়ে, শেষ পর্যন্ত লম্বা একটি লাফ দিয়ে নদী পার হবার ব্যবস্থা।

স্বামীজী হাত ধরে ধরে এক এক করে পথ দেখিয়ে পার করে দিচ্ছেন বিপজ্জনক কোণাগুলিতে হাত ধরে সাহায্য করবার জন্য দিলীপ ও বীর সিংকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে শুরু করেছে!

ওমা! আমরা সবাই চলে আসছি যে!

"ও দিলীপ সিং! কুলিদের জন্য দাঁড়াও, নইলে ওরা ঝুলন্ত পাথরের তলা দিয়ে মাল সুদ্ধ পার হবে কি করে?"

"ফিকর্ মৎ করো বহিন্‌জী! উলোগ্ ঠিক আ যায়গা!" দিলীপ হাসিমুখে জবাব দেয়। তবু যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। দিলীপের মুখে বুঝি বিদ্যুতের মত হাসি খেলে যায়! তবু দাঁড়িয়ে রয়েছি, বিশ্বাস হচ্ছে না, দেখি ওরা নির্বিঘ্নে পার হতে পারে কিনা!

একটু দূরে বসে দেখছি।

কে যেন একজন মাল পিঠে নিয়ে এসে পৌছালো, ওকে তো চিনতে পারছি না! সে ইসারা করে দিলীপের কাছে জানতে চাইছে, কোন্ পথে পার হবে সে। দিলীপও ইঙ্গিতে পথ নির্দেশ করছে। বাঃ দিব্যি পার হয়ে এলো তো সে! পিঠে বোঝাই করা মাল, একটুও মনে হয়না তো তা দেখে?

মনের উপর থেকে একটা বিরাট পাথর নেমে গেল যেন! কালিন্দী নদী পার হয়ে এবার কালিন্দী-হিমবাহের হিমপ্রান্তর ধরে চলেছি। বহুপূর্বেই আমরা চির-হিমরেখায় পৌঁছে গেছি। তাই এখনকার পথ কেবল চিরন্তন তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে। কালিন্দী হিমবাহের তীরে পাথর ছড়ানো রয়েছে—তাও তুষারেরই উপর ছড়ানো।

উঁচু থেকে হিমস্রোত দুদিকের পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে নেমে এসেছে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধবধব করছে সাদা তুষারধারা—শুভ্রতুষারে তৈরী করা রাজপথ যেন! যে সমস্ত পাথর আশেপাশের পাহাড় থেকে গলিত তুষার-প্রবাহের সাথে হিমবাহের উপর নেমে এসেছিল, সেগুলির অধিকাংই স্রোতের নীচে চাপা পড়ে গেছে। দু'টি চারটি এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে—তাও সংখ্যায় খুবই কম।

আগেই বলেছি, হিমবাহ যখন নিম্নভূমির আকর্ষণে ধীরপ্রবাহে চলতে থাকে, তখন দুইপাশের পাহাড়ের সজ্ঘর্ষণের জন্য সমগতিশীল হয় না। এই অসমান গতিশীলতার জন্য তুষার প্রবাহের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ফাটল দেখা দেয়।

এইরূপ তুষার ফাটল (crevasse) মাঝে মাঝে আমাদের পথের এপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রসারিত হয়ে রয়েছে। কোন কোনটি বেশ চওড়া প্রায় সবগুলিই নরম তুষারে আচ্ছাদিত।

লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলতে হয়। একটু অন্যমনস্ক বা অসাবধান হলেই যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদে পড়তে হতে পারে। কোথায়, কখন যে পা বসে যাবে তারও স্থিরতা নেই। তুষারের পথে চলা আমাদের পক্ষে এই প্রথম। দাদা হয়তো আগে এমন পথে কিছু কিছু ভ্রমণ করেছেন। পাহাড়ীরা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, বার বার করে চিনিয়ে দিচ্ছে, নীলাভ তুষারের সরল রেখাগুলি ডিঙিয়ে বা লাফিয়ে চলতে পরামর্শ দিচ্ছে। ওগুলি "কাঁচা" বরফ ঢাকা ফাটল। বড় বিভ্রান্তিকর এবং বিপজ্জনক। হিমবাহের বিভীষিকা।

বছর দুই আগেকার কথা। আমাদের তিনটি হিমালয় পাগল বন্ধু এপথে এসেছিলেন, আমাদেরই মত বেড়াতে। এইভাবে যখন হিমপ্রান্তরের উপর দিয়ে চলতে থাকেন, একজন ভ্রান্ত হয়ে গাইড-নির্দেশ না মেনে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তার ফল খুবই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো। বুঝতে না পেরে

বরফে লুকানো একটি ফাটলে পা, দেওয়াতে তিনি একেবারে একটা গহ্বরে ডুবে গেলেন। গহ্বরটির আট নয় ফুট নীচে তলিয়ে গিয়ে সেখানে আটকে ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে পাতাল-প্রবেশ তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর গাইড এবং অন্যান্য কুলিদের সহায়তায় দড়ি ফেলে একঘণ্টা চেষ্টার পর অন্য দুজনা সঙ্গী তাঁকে উপরে টেনে তুলতে সমর্থ হন। শারীরিক আঘাত তিনি বেশী পাননি, তবে মানসিক আঘাতে এই শক্তিমান, বেপরোয়া মানুষটি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী পথের সবটুকু তাঁকে গাইডের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়েছিল।

আমরা এই দুর্ঘটনার বিবরণ যোধসিং-এর মুখে শুনেছিলাম গঙ্গোত্রীবাস কালে। সে-ই ছিল সে কুলি যে, সাহায্য করেছিল। দাদা (উমাপ্রসাদবাবু) তখন বদ্রীনারায়ণে। দলটি বদ্রীনারায়ণে পৌঁছে দাদার কাছে যখন এই ঘটনা বিবৃত করে, দাদা তখন যোধসিংকে পুরস্কৃত করেছিলেন। সে কথা যোধসিং ভোলেনি। আমরা গঙ্গোত্রী পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে যখন দিলীপ কুলিদের সাথে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে, তখনই যোধসিং দাদাকে দেখে বলে উঠলো—

"উ বাবুকো হাম্ পছান্‌তেহেঁ। উন্‌কো বদ্রীনারায়ণমে দেখা।"

এই ঘটনার বিবরণ তার মুখ থেকেই আমাদের শোনা। তাই এমনি বিপজ্জনক ফাটলের জন্য যে বিপদ যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে তা আমাদের ভালোভাবেই জানা ছিল। দাদাও বারবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন আমরা গাইডের নির্দেশ ছাড়া যেন কখনো চলবার চেষ্টা না করি। হিমবাহে চলা বা তুষারের উপর দিয়ে চলা আমাদের আয়ত্ত নেই, তাই আমাদের সাবধানতারও অন্ত নেই!

লাঠি ঠুকে ঠুকে তুষারের উপর দিয়ে, কখনো বা পাথর ছড়ানো তীর ধরে ধরে সাবধানে এগিয়ে চলেছি। দলের দুর্বলতম মানুষ, তার উপর আমার হাতে লাঠি নেই, দিলীপ তাই এক মুহূর্তের জন্যেও আমার কাছছাড়া হয় না। তার হাতের Ice-axe ঠুকে ঠুকে আমাদের চলার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। দুই পাশের পর্বতশ্রেণীর সাথে হিমবাহের শুভ্ররাজপথও সামান্য বেঁকে গেছে, খানিকটা এগিয়েই স্বামীজী নির্দেশ করে দেখান—

"ওই দেখুন, স্বর্গের সিঁড়ি।" হাসিতে তাঁর সর্বাঙ্গে দুলে ওঠে,

"ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে পারলে স্বর্গে যাওয়া যায়।"

আশ্চর্য এক জগতে উপস্থিত হয়েছি আমরা। প্রথমেই দেখেছি, তুষার মণ্ডিত শিবলিঙ্গ,—যেন জটাজুটধারী দেবাদিদেব মহাদেব বসে আছেন,—তাঁর পাশে মহামায়া "ভাগীরথী" রূপে বিরাজ করছেন। বৃদ্ধ "ভৃগুমুনি" "তপোবনের" আশ্রমে ব'সে এঁদের সম্মুখে নতমস্তকে তপস্যায় মগ্ন রয়েছেন!

সূর্যদেব তাঁর দৈনন্দিন প্রদক্ষিণ শুরু করেছেন "সুদর্শন" পর্বতের পিছন থেকে, তাঁর প্রথম প্রভাত-কিরণ-অর্ঘ্য শিব পাদপদ্মে তর্পণ ক'রে; "নন্দনবনের" নানাদিকে "চন্দ্রাদি" দেবতা বিরাজ করছেন,—তাই এখানে তাঁদের বাসভূমি আছে—"সুরালয়"। নাগরাজ "বাসুকি" ফণা বিস্তার করে "কালিন্দী" তীরে লীলারত রাধাশ্যাম সহ সব দেবতাদের ঝড়, বৃষ্টি, আতপ হতে রক্ষা করবার জন্য যেন সদাই ব্যস্ত! একপাশের "সুমেরু" শিখরকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব চরাচর প্রদক্ষিণ করছে। কেদারেশ্বর "কেদার নাথ" শিব যেন বার্দ্ধক্যের ভারে অবনত, ভোলানাথ আপন ভোলা এদিকে নিঃশব্দে বসে আছেন। এমন রাজ্যে স্বর্গের সোপান থাকাটা কিছু বিচিত্র নয়!

আমাদের চলার পথে হিমবাহের শুভ্র-রাজ-পথের একপাশ দিয়ে যে পর্বতশ্রেণী এগিয়ে চলে গেছে, তারই দুটি শিখরের খাঁজের মাঝখান দিয়ে বিশাল একটি চির শুভ্র হিমস্রোত যেন আকাশে জন্মে নীল আকাশের গা বেয়ে নেমে নীচের হিমবাহতে মিশেছে। ঠিক যেন একটি বিশাল জলপ্রপাত, একটি বিরাট নদীতে মিশছে,—কিন্তু জলপ্রপাত নয়, হিমপ্রপাত এসে হিমধারাতে মিশেছে। জলপ্রপাতের জলের ঢেউগুলি কলোচ্ছ্বাসে এঁকে বেঁকে নামছিল, কার মায়াদণ্ডের স্পর্শে একমুহূর্ত্তে জমে তুষার হয়ে গেছে। "কল্লোলিনীর কলগুঞ্জন" থেমে গেল—কিন্তু তার স্তব্ধরূপ ভঙ্গিতে সে নীরবতাও যেন মুখর হয়ে উঠেছে। অপূর্ব!

আমরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছি। "Ice fall! Ice fall ওইতো Ice fall!"

বিখ্যাত পর্বতারোহীদের বিখ্যাত শিখর আরোহণের ইতিহাসের সাথে সাথে তাদের লেখা বইতে যেমন ছবি দেখেছি, অবিকল তেমনি!

ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই, ভ্রান্ত হবার কোন পথই তো তাঁরা রাখেনি।

২৯০২৮ ফুট উঁচু শৃঙ্গ এভাবেই আরোহণ করে এসেছেন সর্বপ্রথম তেনজিং নোরকে, দুই-দুইবার আরোহণ করেছেন নওয়াং গোম্বু—আমাদেরই দেশের ছেলে। "খুম্বু" Ice fall পার হয়ে তাঁদের চলবার পথ ছিল। স্বর্গের সিঁড়ি পার হয়ে তারা যে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন! আমরাও কি ওই সোপান পার হলে নারায়ণ ধামে পৌছাতে পারব?

উত্তেজনায় আমরা যেন কাঁপতে থাকি। স্বামীজী তুষারের উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপেরও নীচে তিনি মিনতি ভরা দৃষ্টি তুলে যেন স্বর্গের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার স্বামী ছবি তুলবেন, তাই তিনটি ক্যামেরাই খুলে বসেছেন। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে সম্মুখে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

আমাদের বেশীক্ষণ থামবার উপায় নেই, বেশীক্ষণ দেখবারও উপায় নেই। তাই আমরা আবার চলা শুরু করে দিয়েছি। স্বর্গের তুষার সিঁড়ির পরিবর্তে মর্তের তুষারক্ষেত্রে পা ফেলে ফেলে আবার চলতে শুরু করেছি—কালিন্দী হিমবাহের তীর ঘেঁসে ঘেঁসে, কখনো বা পাথরে পাথরে পা ফেলে আবার এগিয়ে চলেছি।

ক্রমাগত চলে চলে এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবু নব নব দৃশ্যের সম্মুখীন হয়ে ক্লান্তির কথা মনেও পড়ছে না, দারুণ উত্তেজনাবশে ক্রমাগত শক্তিসংগ্রহ করে এগিয়ে চলেছি। অক্সিজেনের অভাব আজ যেন আরও বেশী করে অনুভব করছি। কয়েক পা চলেই দম নিতে থামতে হচ্ছে। অঞ্জলি ভরে ফাটল থেকে সংগ্রহ করা তুহিন শীতল জলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছি। কিন্তু এমন পথে জীবনে কখনো চলবো বলে স্বপ্নেও কি ভেবেছি?

Ice-fall আমাদের চোখের আড়াল হতেই আবার একটি নতুন দৃশ্য সামনে এগিয়ে আসে। আমাদের চলার পথের পাশে হিমবাহের তুষারের উপর দেখছি, হিমবাহের একটি অংশে কেমন বড় বড় তুষারের সরু সরু মন্দিরের চূড়ার মত—তুষার-প্রান্তরের একটি এলাকা জুড়ে অগুন্তি জমে আছে। এগুলি Ice-séracs। এর কোন কোনটি এক মানুষ, দেড় মানুষ-সমান উঁচু, অধিকাংশই তার চেয়ে ছোট। প্রকৃতির কি এক লীলার ফল এই সুন্দর শুভ্র sérac গুলি। রৌদ্রের উত্তাপে কোন কোনটি গলে ভেঙে যাচ্ছে তার ধার বেয়ে বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে টুপ্ টুপ্ করে!

আবার পড়তে পড়তেই কোথাও কোথাও জমে যাচ্ছে। রামধনুর সপ্ত-রঙের খেলা দেখতে পাচ্ছি—সূর্য্যালোকে ঝিল্‌মিল্‌ করছে তুষারের সরু ফালিগুলি। যেন মন্দিরের চূড়া থেকে নীচ অবধি আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে, আশ্চর্য সুন্দর দেখতে! এগুলির কাছ দিয়ে আমাদের চলবার পথ ছিল, কিন্তু এগুলিকে সামান্য দূরে রেখে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। প্রকৃতির অলৌকিক রূপসজ্জায় সজ্জিত কারুশিল্প, কিন্তু ভয়ঙ্কর! যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে আমাদের সমাধিস্থ করতে পারে। পর্বতারোহণের ইতিহাসে তার নজিরের অভাব নেই।

বেলা আড়াইটা কি তিনটা পর্যন্ত চলবার পর স্বামীজীর কাছ থেকে থামবার অনুমতি আদায় করা গেল। আরও কিছুদূর এগিয়ে কালিন্দী খাল ( ১৯,৫১০ ফুট ) পোঁছানোর শেষ চড়াই-এর নীচে পর্যন্ত যাওয়া স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল, কালতো "খাল" পার হতে হবে, অর্থাৎ আরও ( ১,৫০০ ফুট ) দেড় হাজার ফুট চড়তে হবে। আজ একটু এগিয়ে থাকাই ভালো হ'ত!

চারিদিকে উঁচু উঁচু পর্বতশ্রেণী ঘেরা। হিমবাহের হিমস্রোতের পাশে তুষার-আঁটা পাথরের উপর আমাদের তাঁবু পড়লো। স্থানটি সমুদ্রতল থেকে ( ১৮,০০০ ফুট ) আঠারো হাজার ফুট উঁচু, সীতা হিমবাহের প্রান্ত।

আমাদের সম্মুখে, দূর থেকে পর্বতশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে শুভ্রবর্ণ হিমবাহের রাজপথ নেমে এসে পাশ দিয়ে নীচের দিকে বয়ে গেছে। আরও উঁচুতে ঐ শুভ্র হিমবাহের রাজপথ বেঁকে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে, যেন একটি বিশাল খড়্গের শুভ্রফলা দুই পাহাড়ের মাঝখানে পড়ে আছে। তাই বোধকরি এই হিমবাহের নাম কালিন্দী-খড়্গ-হিমবাহ।

মেঘহীন নীলাকাশ। চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে। শান্ত পরিবেশ। হঠাৎ মেঘ-গর্জনের আওয়াজ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে গুড়-গুড়-গুড়-গুড় করে একটানা প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হ'তে থাকলো। চমকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, কই মেঘ নেই তো কোথাও? তবে, মেঘ গর্জন হচ্ছে কি করে? অবাক হয়ে সবাই চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। অজানা আশঙ্কায়, ভয়ে বুক দুরুদুরু করে।

একটু বাদে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, সম্মুখের হিমবাহ উপরে যেখানে বেঁকে গেছে তার ডানদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকের পাহাড় ভেঙে উপর থেকে

বিরাট বিরাট পাথর ও বরফের চাক গড়িয়ে পড়ছে! তারই বিকট আওয়াজ চারিদিকের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে! সামনের পাহাড়টাতে তবে ধস্ নামছে?

ধসের পাথর গড়িয়ে আমাদের তাঁবুতে পেঁছতে পারবে কি? উঁহু, মনে হয় না। পাহাড়টা কমপক্ষে আধ মাইল দূরে, এতদূরে বিপদের সম্ভাবনা কম।

খানিকক্ষণ চারিদিক নিস্তব্ধ। আবার তেমনি মেঘ গর্জনের মত আওয়াজ! আবার বড় বড় পাথর গড়্‌গড়্‌ করে গড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠছে। সারা সন্ধ্যা, সমস্তটা রাত ধরে এইভাবে খানিক পরপর ধস নামা চলতে থাকলো। মনে মনে ভাবি, পাহাড়টার আয়ু আর কতদিন বা আছে!

ছয়টা বেজে গেল, কিন্তু বাইরে এখনো বেশ রৌদ্র। তবে তীব্র শীত ও হাওয়া। হাঁটবার সময় ততটা বোঝা যায় না, বসে থাকলেই শীতটা অসহ্য মনে হয়। শরীরের ভিতর হাড়ে কাঁপুনি ধরে যায়। হাওয়াটাই বেশী কষ্ট দেয়। ঠাণ্ডায় শিঁটিয়ে সকলে তাঁবুর ভিতর শ্লিপিং-ব্যাগে ঢুকে পড়েছি।

আজ ভাত রান্না করার চেষ্টা বৃথা। তাই ঝাল মশলা ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে বেসনের গরম স্যুপ ও মসলাদার পরোটা দিয়ে ভোজন। অপূর্ব তার আস্বাদ। স্বাদেই বেশ বোঝা যায়, আজ আবার স্বামীজী রান্না করেছেন।

আজও অনেকের মাথা ধরেছে। দিলীপ আমাদের কাছ থেকে aspirin নিয়ে বিলোচ্ছে। তাছাড়া শরীর ভালো থাকবে এই ভরসাতে, ভিটামিন ট্যাবলেটও খাচ্ছি সকলে মিলে। স্বামীজী অনেকটা ভালো বোধ করছেন— তবু তাঁর জ্বরভাব ও মাথাধরা আজও কিছুটা রয়েছে বলছেন। তিনিও আমাদের সাথে ডাক্তারী ওষুধ খাচ্ছেন।

# ভারতীয় পর্বতারোহণ

এই দুর্গম অঞ্চলে কেবল যে ইউরোপীয় পর্বতারোহীরা এসেছেন, একথা মনে করলে ভুল হবে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে এই অঞ্চলে ভারতবাসীর যাতায়াত ছিল, তার কোন লিখিত পুস্তক নেই, কিন্তু অকাট্য প্রমাণ পাই আমরা সহজেই, এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামকরণে।

চলবার পথে আগেই দেখেছি, রক্তবর্ণ-প্রস্তরাচ্ছাদিত হিমবাহের নাম রেখেছেন তাঁরা "রক্তবর্ণ হিমবাহ"। তেমনি আবার দেখছি, চারটি বর্ণের সমাবেশে উজ্জ্বল হিমবাহের নাম রেখেছেন তাঁরা "চতুরঙ্গী হিমবাহ"।

এইভাবেই শুভ্র-প্রস্তর সমাচ্ছন্ন হিমবাহের নামকরণ হয়েছে "শ্বেত-বরণ হিমবাহ"। অন্যান্য আরও কতকগুলি হিমবাহ আছে "সচ্ছন্দ", "ঘনহিম", "ভাগীরথী-খড়্গ", "সত্যপদ", "কীর্তি", "সুরালয়", "বাসুকি", "দুধগঙ্গা" প্রভৃতি। এইসব হিমবাহ অতি দুর্গম-প্রদেশে অবস্থিত, কিন্তু এগুলির প্রচলিত নাম ভারতীয়-শব্দে। এদের নামের অর্থের সঙ্গে কোনটির বর্ণ, কোনটির অবয়বের সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই থাকে না যে, এই দুর্গম প্রদেশে প্রাচীন ভারতীয়দের যাতায়াত ছিল। কিন্তু তাঁরা নগ্ন পায়ে, নগ্ন গায়ে কি করে বিচরণ করতেন তা আমাদের বুদ্ধিরও অতীত। তাঁদের দেওয়া এই সকল বৈশিষ্ট্যসূচক নামে আমরা আরও বিস্মিত হয়ে যাই।

এই অঞ্চলে একটি বহুল প্রচলিত উপাখ্যান শোনা যায়। তাতে বলে, প্রাচীনকালে একই পূজারী কেদারনাথ ও বদরীনাথের দৈনিক পূজা করতেন। এটা সম্ভব কিনা এখন বলা কঠিন, তবে এখনো যে সব সাধু মহাত্মা গোমুখের কাছে বাস করেন, জানতে পারলাম তাঁরা নাকি বারোমাসই এখানে বাস করেন। তাঁদের নগ্নদেহ দেখে, এবং স্বচ্ছন্দ চলার ভঙ্গি দেখে এই গল্প অবিশ্বাস করবার প্রশ্ন যেন কেন আপনা আপনিই মিলিয়ে যায়।

মহাভারতেও এইসব অঞ্চলের উল্লেখ আছে। মহর্ষি বেদব্যাস নাকি বদরীনাথের নিকট অবস্থিত মানা-গ্রামের এক গুহাতে বসে তাঁর মহাভারত রচনা করেছিলেন। পাণ্ডবগণ এই অঞ্চলেই এসেছিলেন মহাপ্রস্থানের জন্য।

কিন্তু আধুনিক পর্বতারোহণের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি, ভারতীয়েরাও এখন পর্বতারোহণে আর পিছিয়ে নেই। আধুনিক শিক্ষা ও সাজসরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ করেই তাঁরাও এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন পর্বতশিখর আরোহণ করতে। এই অঞ্চলেই দেখতে পাই ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "আবিগামিন" (২৪,১৩০ ফুট) শিখর আরোহণ করেছেন স্বনামধন্য 'নান্দু' জয়াল ও দুজন শেরপা পেম্বা সুন্দর ও পুরণ সিং। দুই বৎসর পর "কামেট" শৃঙ্গেও তিনি আরোহণ করেন ১৯৫৫ সালে। কামেটের উচ্চতা ২৫,৪৪৭ ফুট! সঙ্গে ছিলেন চারজন বিখ্যাত শেরপা।

১৯৫৮ সালে ত্রিশূল ( ২৩,৩৬০ ফুট ) আরোহণ করেন শেরপা আংনিমার সহিত সাব-লেঃ পি, মেহেতা।

ঐ সালেই মৃগথুনি ( ২২,৪৯০ ফুট ) আরোহণ করেছেন গুরুদয়াল সিং, আমীর আলি ; আর, ভি, সিং ; কল্যাণ সিং ও ধীরণ সিং।

১৯৫৯ সালে বন্দরপুছ্ শিখর ( ২০,৭২০ ) ও চৌখাম্বা (১) ( ২৩,৪২০ ফুট ) শিখর ;

১৯৬০ সালে "নন্দাঘুণ্টি" ( ২০,৭০০ ফুট ) শিখর ;

১৯৫৩ সালে "দেবীস্থান ( ২১,৯১০ ফুট ), মাইকতোলী ( ২২,৩২০ ফুট ) ও নন্দাখাত ( ২১,৬৯০ ফুট ) ;

১৯৬০ সালে নীলগিরি ( ২১,২৬৪ ফুট ) শিখর ;

১৯৫৯ সালে হাতিপর্বত ) ২২০৭০ ফুট ) ;

১৯৬০ সালে ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ নন্দাদেবী ( ২৫,৬৪৫ ফুট ) শিখর ও পঞ্চচুল্লীর তিনটে শৃঙ্গ III ( ২০,৭১০ ফুট ) IV ( ২০,৭৮০ ফুট ) ও V ( ২১,১২০ ফুট ) ;

১৯৫৯ সালে চন্দ্রপর্বত ( ২২,০৭৩ ফুট ) শিখর আরোহণ করেছেন ভারতীয় পর্বতারোহীগণ। ১৯৬৯ সালে লেঃ কমাণ্ডার কোহ্‌লির নেতৃত্বে পরপর নয় জন ভারতীয় এভারেষ্ট ( ২৯০২৮ ফুট )-এর চূড়ায় ওঠেন।

ভারতীয় মেয়েরাও পিছিয়ে নেই, তাঁরাও পর্বতারোহণ-শিক্ষা গ্রহণ করে

আরোহণ করেছেন শ্রীকৈলাশ ( ২২,৭৪০ ফুট ) শিখর ও "মাতৃপর্বত", ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে "মৃগথুনি" ( ২২,৪৯০ ) আরোহণ করেছেন।

এই সমস্ত শিখরগুলিই এই গাড়োয়াল অঞ্চলের। তার কয়েকটি শিখর আমরা চলবার সময় দেখতে পেয়েছি।

* * * *

১৯৩৮ সালে যখন অষ্ট্রোজার্মান দল এই অঞ্চলে এসে বহুদিন এই পর্বতাঞ্চল ভ্রমণ করেন, তখন কতিপয় সাধুর মনে "কালিন্দীখাল" গিরিবর্ত্ম হয়ে "বদরী-নাথ" যাবার বাসনা জাগলো। তাঁরা একত্রিত হয়ে পর্বতারোহীদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে রাখেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের পর ১৭ই জুলাই এক শুভ প্রভাতে তাঁরা রওনা হলেন। দলে ছিলেন, স্বামী দয়ালদাস উদাসী, স্বামী কৈলাশগিরি, মহাবীর দাস উদাসী, কলাহারী মুনি, অবধূত পরমানন্দ ( নাঙ্গা ), দিলীপসিং ও স্বামী প্রবোধানন্দ। সকলেই গঙ্গোত্রীবাসী সাধু; কেবল দিলীপ সিং গাইড হিসাবে এঁদের সঙ্গ নেয়। এঁদের একজন মৌনী ও একজন নাঙ্গা ছিলেন। সরঞ্জাম এঁদের কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু মনে ছিল অদম্য বাসনা। অসীম সাহস দেখিয়ে তাঁরা বহু কষ্টে কালিন্দী-গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বদরীনাথ যেতে সমর্থ হন। সম্ভবতঃ ভারতীয় দলের কালিন্দী-খাল অতিক্রম সেই প্রথম।

আমাদের দলপতি স্বামী সুন্দরানন্দজী এই পথে ছয়বার গিয়েছেন। কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এমনি একটি সাধুর দল নিয়ে তিনি বদরীনাথ গিয়ে সেই পথে ফিরেও আসেন। এখন প্রায় প্রতি বৎসর দু'একটি অসমসাহসী দল এই পথে যান, কিন্তু তার সংখ্যা অতিশয় কম।

# কালিন্দী-খাল-গিরিবর্ত্ম (১৯,৫১০ ফুট)

২৮শে জুলাই। কাল রাত্তিরে প্রচণ্ড শীত ও অক্সিজেনের অভাবেই বোধ হয়, কারুরই ভালো ঘুম হয়নি। সামনের পাহাড়ের ধস নামার শব্দও তার খানিকটা কারণ হয়ত। ডাক্তার-সাহেবের নিঃশ্বাসে কেমন একটা অস্বস্তিকর আওয়াজ হচ্ছে—তাতে অবশ্য কারুরই ঘুমের ব্যাঘাত হবার কথা নয়। আমরা ভাবছি অন্য কথা।

কাল আমরা তাঁবু বদল করে নিয়েছিলাম। দাদাদের High-altitude Nylon-tentখানা আমরা নিয়েছি, আর আমাদের Meade-tentটা ওঁদের দিয়েছি। নতুন তাঁবুর ব্যবস্থায় কিসে যে সুবিধা হবে বোঝা যাচ্ছে না। তাঁবুর সবদিকের জিপ্ টেনে বন্ধ করে দিলে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, আবার কিছুটা খুলে রাখলে ঠাণ্ডা হাওয়াতে জমে যেতে হয়। দুই দলেরই সমান অবস্থা। আজ সকালে রৌদ্রের মধ্যে বসে যখন ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বুদ্ধির জট খুলে গেছে, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ দোষ তাঁবুর নয়, দোষ ১৮,০০০ ফুট উচ্চতার!

প্রত্যুষে আজ স্বামীজীর স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙেছে। কাল রাত্রে তো তাঁর জ্বরভাব ছিল, মাথাধরা ছিল! আজকের গলার আওয়াজে তার কোন আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না।

উদাত্ত কণ্ঠে দিগন্ত মুখরিত করে তিনি গাইছেন—

"দিব্যায়, দেবায়, দিগম্বরায়
তস্মৈ য-কারায়, নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায়॥ নমঃ শিবায়॥

সুরের মূর্ছনা কেঁপে কেঁপে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

আজ আমাদের পথের সর্বোচ্চ প্রান্তে আমরা পৌঁছাবো। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গিরিবর্ত্মে, কালিন্দীখাল (১৯৫১০ ফুট) আজ আমরা পার হবো।

স্বামীজী বিপত্তারণ মঙ্গলময়ের দরবারে সকলের হয়ে তাঁর আকুল আবেদন পৌঁছে দিচ্ছেন।

হে বিপত্তারণ মধুসূদন! নারায়ণ! আমাদের পথ নির্বিঘ্ন করো। আমাদের সকলকে নিরাপদে বদ্রীনাথধামে তোমার পদতলে পৌঁছে দাও!

চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে।

খানিকক্ষণ বাদে পাহাড়ীদের চলাফেরার আওয়াজ পেলাম। ক্রমে পাশের তাঁবু থেকে মেজর-মহারাজের শীতার্ত কণ্ঠ শোনা গেল। বহুদিন ক্ষৌরীর অভাবে মেজর-সাহেবের পক্ব শ্মশ্রুগুম্ফসজ্জিত চেহারাতে একটা সাধু-সুলভ ছাপ পড়েছে। পাহাড়ীরা তাই গঙ্গোত্রীতে ওঁকে দেখার প্রথমদিন থেকেই "মেজর মহারাজ" বলে ডাক্‌ছে।

বাইরে প্রচণ্ড শীত। কেউই এত ভোরে বাইরে বের হতে রাজী নই।

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। এবার দাদার স্বচ্ছ দ্বিধাহীন কণ্ঠস্বর শুনছি, বলছেন,—"বুঝলেন মেজর! আজকের মতন এমন পরিষ্কার দিন এ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যে জোটেনি!"

হুঁ, বুঝতে পারলাম, দাদা এবং মেজর, দুজনেই তাঁবুর বাইরে বেরিয়েছেন। জেগে আর কতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। আমরাও তাঁবুর দরজা ফাঁক করে বাইরেটা একবার উঁকি মেরে দেখি। দেখি, যদি বেরনো যায়! কিন্তু বাপ্‌রে! কি ঠাণ্ডা! তাড়াতাড়ি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়েছি। দাদা ও মেজর সাহেব ও আবার ভিতরে ঢুকেছেন।

রৌদ্র আমাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছাতে বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেল। তবে, তার আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা সজীব মানুষ। তাঁবু গুটিয়ে যাত্রার তোড়জোড় করতে শুরু করেছি। আজ আমাদের কালিন্দীখাল পার হতে হবে—মনে সবাই বেশ একটা উদ্বেগ অনুভব করছি।

রওনা হবার আগে দিলীপ আমাদের সকলের পা, জুতো, মোজা দেখে নিচ্ছে। বলছে, যদি সঙ্গে থাকে তবে আজ পট্টি পরে নিন। কতো গর্তে পা পড়বে, পট্টি পরা থাকলে পা ভিজবে না। নইলে পায়ের জুতোর মধ্যে বরফ ঢুকলে মোজা ভিজে যাবে। আমাদের জানা ছিলো না, তাই পট্টি আমরা আনিনি, আমরা মোজাই দু'জোড়া করে পরে নিয়ে পায়ের উপর দড়ি দিয়ে আঁট করে বেঁধে নিলাম।

আধ মাইলের বেশী চওড়া হিমবাহের মাঝখান দিয়ে উত্তর-পূর্বদিকে আমাদের চলবার পথ। চলা শুরু করবার একটু পরেই আমরা বুঝতে পারি চিরন্তন তুষার রাজ্যের মধ্য দিয়ে আমরা আজ চলেছি। মাথার উপর গাঢ় নীলাকাশে আবরণহীন তপন যেন আগুন ছড়াচ্ছে। তারই আগুনে নীচের দিগন্ত-বিস্তৃত তুষারপ্রান্তরও জ্বলছে। ক্ষতি নেই তাতে, আমরা তো আগেই কালো-চশমা পরে নিয়েছি। কিন্তু অসংখ্য ফাটল পড়ছে আমাদের পায়ের সম্মুখে। নরম তুষারের ঢাকা ফাটল। নীলাভ-শুভ্র তুষারের রেখা যেন! সেগুলি সাবধানে অতিক্রম করে পথ চলা। কোন কোন ফাটল দিয়ে শুভ্র স্বচ্ছ জলধারা বয়ে চলেছে। সেগুলি সযত্নে পার হয়ে চলা। পদে পদে পদস্খলন হবার সম্ভাবনা। পিচ্ছিল-পথ, শক্ত তুষারের পথ কিনা তাই পিচ্ছিল।

দিলীপের মতে বরফের উপর দিয়ে চলা সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক। কারণ, বিপদ যে কোথায় কোন ফাটলে লুকিয়ে থাকে, তা একটু আগেও জানা যায় না।

খুব সাবধানে চলেছি তাই। তবু অসতর্ক মুহূর্তে একটি পা ডুবে গেছে তুষারে ঢাকা ফাটলের মধ্যে!

—"সাবধান"—দিলীপ সতর্ক করে তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে তুলেছে। "বহুৎ সাবধানসে চলো বহিন্‌জী! চোট্ নেহি লাগা তো?"

—"ন্ না।" বলে জামা কাপড় থেকে শুকনো তুষার ঝেড়ে ফেলে আবার চলতে শুরু করেছি। খুব সতর্কতার সাথে চলেছি এবার, একটি নীলাভ রেখাও আর নজর এড়াতে পারে না। তবু আবার পিছলে পড়ে আছাড় খেয়েছি! এবার কিন্তু ফাটলে নয়, শক্ত বরফের উপর পিছলে পড়ে গেছি, চোট্ লাগবার ভয়ে দেহটি আলগোছে ছেড়ে দিয়েছি, তাই একেবারে চিৎপাৎ!

"বহিন্‌জী, Ice-axe তুম্‌হারি হাত্‌মে লে লেও। এ্যায়সা করকে ঠোক্‌কে ঠোক্‌কে দেখো ঔর চলো।"

"না, দিলীপ, Ice-axe-এ আমার পোষাবে না। আমি শুধু হাতে এমনিই চলবো বেশ। ওটা বড় ভারি। ও আমার পছন্দ নয়।"

আবার মনে মনে ভাবছি, ওই Ice-axeটিই আমাদের দলের একমাত্র সম্বল। চড়াই পথে উঠবার সময় বরফ কেটে পথ তৈরী করবার জন্ত তো

দিলীপের হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। এখন এইটুকু পথের জন্য নিয়েই বা কি সুবিধা হবে!

—"শ্'শালা। বরফ্!"

দিলীপ আছাড় খেয়েছে এবার! ওর পা হাঁটু অবধি ডুবে গেছে নীলাভ তুষারে। আলগোছে ধরা মুঠি থেকে হাত টেনে নিয়েছি আত্মরক্ষার তাগিদে। নইলে বেসামাল হয়ে আমি সুদ্ধ পড়ে যাব। এবার আমার বলবার পালা।

মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করে বলেই ফেলি—"চোট্ লাগেনি তো? সাবধানসে চলো।"

কিন্তু পেটের ভিতর হাসি গুর্ গুর্ করে উঠ্ছে। খুব সাবধানে হাসি চেপে কথা বলছি।

"নেহি।"—দিলীপ মুখ বিকৃত করে।

শুভ্র তুষাবের মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর দেখতে পেলেই আর কথা নেই। তার উপর বিশ্রাম করবার জন্য বসে পড়ি। বিশ্রামের ফাঁকে দেখবার চেষ্টা করি; আমার মত আর কে কতবার আছাড় খাচ্ছে। দমাদ্দম যে পড়ছে, নিশ্চয়, তাতে সন্দেহ নেই। তবু দেখছি, দিলীপের Ice-axe ঠুকে এবং আমাদের দুজনের পায়ের চাপে যে পথ তৈরী হচ্ছে, তাতে ওঁদের খানিকটা সুবিধাই হচ্ছে। আমাদের পদরেখায় পা ফেলে ফেলে আসছেন দাদা ও সত্যেনবাবু। এঁরা দুজন একাএকাই চলেছেন বটে, কিন্তু চলবার সময় সর্বদাই দিলীপেব পিছন পিছন চলেছেন, তারই পদক্ষেপ নজরে রেখে, তারই তৈরী করা পথে। আর উনি চলেছেন স্বামীজীর সাথে, ছবি তুলতে তুলতে। স্বামীজীরও ছবি-তোলার উপর ঝোঁক, তাই দুজনে একত্র থাকাতে সুবিধাও হয় খুব। স্বামীজী ভালমন্দ পথের বিশেষ তোয়াক্কা করেন না। চললেই পথ চলা হল, এই-ই বোধ হয় তাঁর মত। ওঁর হাত স্বামীজীর হাতের মুঠোয় ধরা। দুজনে পিছিয়ে পড়েছেন কতকটা। আজ অনেক ছবি তুলতে হচ্ছে। সময়ের প্রয়োজন তাই বেশী হয়ে পড়েছে।

মাঝে মাঝে সত্যেনবাবুও বীরসিং এর কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নিচ্ছেন। দাদার ক্যামেরাও দাদার চোখের সামনে ধরা দেখছি মাঝে মাঝে। বীরসিং আজ অদ্ভুত সাহায্য করছে। ওদের সাথে সাথেই রয়েছে। প্রয়োজনমত সকলের কাছে গিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে দিচ্ছে।

তুষার-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে আরও চওড়া হয়ে গেছে। দুইদিকে তুষারমণ্ডিত চূড়াবিশিষ্ট নিকষকালো পাহাড়ের সারি। তুষারের পটভূমিতে অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছে। কোন কোন পর্বতের ঢাল কম তাই পর্বতের চূড়ার উপর থেকেই তুষার নীচ অবধি ঢেকে শুভ্র করে রেখেছে।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ তুষার-প্রান্তর দুইভাগ হয়ে গেছে। একটি অংশ উত্তরদিকে দুটি কালো শৃঙ্গের মাঝখানের চড়াইপথ বেয়ে উপর দিকে উঠে নীলাকাশের নীলিমার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্য অংশ আমাদের ডানদিকে বেঁকে পূর্বদিকের চড়াই পথ ধরেছে। সেটির শেষপ্রান্ত এখনো আমাদের চোখের আড়ালে। স্বামীজী অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখান—

"ওই পূর্বদিকের পথ ধরে আমরা চলবো এখন। ওরই শেষে 'কালিন্দী খাল'!

খুব ধীরে ধীরে চলেছি সবাই। চড়াই বিশেষ নেই। পথও প্রায় সমতলের উপর দিয়ে তাই এগোনো সহজ। তবু অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট বোধ করছি সবাই। একটানা বেশীদূর যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটু চলেই হাঁপিয়ে পড়ছি। থেমে থেমে তুষারগলা ছোট ছোট ধারা থেকে ঠাণ্ডা জল খাচ্ছি। কখনো কখনো জলাভাবে শুভ্রতুষার মুঠি করে তুলে মুখে পুরে চুষে তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা করছি। তৃষ্ণায় সর্বশরীর হাঁবিয়ে উঠেছে। তুষারপানে পরম তৃপ্তি বোধ হচ্ছে। কিন্তু, সেও ক্ষণিকের জন্যে। আবার, গলা শুকিয়ে ওঠে।

তুষার খেতে দিতে পাহাড়ীদের প্রবল আপত্তি, ওরা বলে, পেট গরম হবে, বেমার হবে!

কিন্তু জয়! তৃষ্ণা রাক্ষসীর জয়!

আমাদের দেখাদেখি কিনা জানিনা, মাঝে মাঝে ওরাও কিন্তু লুকিয়ে তুষার মুখে পুরে চুষছে!

কিন্তু আজ আমারই দিন। আজ আমি খুব ভালো হাঁটতে পারছি। অতি সহজে, এতো দূরে এগিয়ে এসেছি যে দূর থেকে দাদা ওঁদের ছোট্ট ছোট্ট পুতুলের মত দেখাচ্ছে। দেহে মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা, আজ কালিন্দীখালের উপর উঠবো। সমুদ্রতল থেকে যার উচ্চতা ১৯৫১০ ফুট! হিমালয়ের মত বৃহৎ পর্বতরাজ্যেও এ উচ্চতা অবহেলা করার মত নয়।

তুষারভয়ে ভীত দিলীপ বলছে,—"থোরা ধীরে ধীরে চল্না বহিন্জী। টলোগ কো আনে দেও। সব আদ্‌মী এক সাথ্ চলো।"

ওর ভাবনা দাদা ও সত্যেনবাবুর জন্য। ওদের কাছে আকস্মিক বিপদে সাহায্য করবার মত কেউ নেই।

"ঠিক আছে, আমি বসছি, কিন্তু বেশীক্ষণ থামবো না আমি। আজ আমি আগে আগে চলবো। আমিই আজ কালিন্দীখালের উপর আগে উঠবো কিন্তু।"

ছেলেমানুষী কথা শুনে দিলীপের ভাবলেশহীন মুখেও হাসি জেগে উঠেছে। —"ফিকর্ মৎ করো।" প্রশ্রয়ের সুরে আশ্বাস দেয় সে।

দাদারা সকলেই কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আবার তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করে দিই।

এখন বেলা এগারোটা বেজেছে। আমরা কালিন্দীখাল গিরিবর্ত্মের শেষ চড়াই-এর পাদদেশে পৌছেছি। উত্তর দিক ছেড়ে এখন পূর্বদিকে বাঁক নিতে হবে।

যে বিস্তীর্ণ হিমপ্রান্তরের শুভ্র-রাজপথ ধরে আমরা এসেছি, সেটি যেন এখানে একটি বিশাল শুভ্র উপত্যকায় এসে শেষ হয়েছে। তিনদিকে তুষারাবৃত উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ একে ঘিরে রেখেছে, একদিকের হিমবাহ স্রোত নীচের দিকে নেমে গেছে। তিনদিককার পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তিনটি হিমস্রোত এবং আশেপাশের পাহাড়ের গায়ের হিমানী নেমে এসে এখানে জমা হচ্ছে। এই উপত্যকাটি একখানি বিশাল হিমাধার (né vé basin)। তিনদিক থেকে ক্রমাগত তুষার এগিয়ে এসে জমে এখান থেকেই কালিন্দী হিমবাহ দক্ষিণপশ্চিমদিকে তার অভীষ্ট পথে যাত্রা শুরু করেছে।

পূর্বদিকে দেখতে পাচ্ছি, হিমবাহ বেঁকে গেছে। আমাদের চলবার পথ তারই চড়াই বেয়ে। এই হিমধারার বামতীরে তুষারবিহীন কৃষ্ণবর্ণ পর্বত। ঢালু বেশী, তাই তুষার জমতে পায়নি, কিন্তু পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যে তুষার এখনো আটকে আছে, সূর্যতাপ পেয়ে সেগুলি গলে ঝর্‌ঝর্ করে ছোট ছোট ধারায় পড়ছে, তার সাথে সাথে পড়ছে বালি ও ছোট ছোট পাথর।

হিমধারার ডানদিকে কালিন্দী-পর্বত-শৃঙ্গ ২১,১৪০ ফুট উঁচু। চির-তুষারাবৃত। এর নীচে উপরে কোথাও আর বাকি নেই,—সম্পূর্ণই শুভ্রবর্ণ।

জমা তুষারে কেমন যেন ভোঁতা হয়েছে এর শৃঙ্গটি। সাদা ও কালো এই দুটি শৃঙ্গের মাঝখানের তুষারপ্রবাহ পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে থেমে গেছে নীল আকাশের গায়ে। এই-ই আমাদের চলার পথের উচ্চতম প্রান্ত! নির্মেঘ, গাঢ় নীলবর্ণ আকাশের গায়ে তুষারের পথ বেয়ে কি পৌঁছাতে পারবো? দেখতে পাবো ওই নীলিমার ওপারে কি আছে? দেখতে পাবো "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" বন্ধু কি সত্যই আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে? ওই—ওই শেষ প্রান্ত, বেশী দূর আর নেই!

স্তব্ধ তুষার-রাজ্য! স্তব্ধ চারিদিকের পর্বতরাজ্য!

আমাদের হৃদয়ের হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনও যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ!

কালিন্দী-পর্বত তার তুষার চাদরখানি চূড়ার উপর থেকে এগিয়ে এনে আমাদের পথের শুভ্রতার সাথে একাকার করে মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা এই বিস্তীর্ণ শুভ্রতার মাঝে কয়েকটি কালো বিন্দুর মত অতি ক্ষুদ্র, নেহাৎই বেমানান। যেন, যে কোন মুহূর্তে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি—বিলীন হয়ে যেতে পারি ওই চিরন্তন শুভ্রতার মাঝে!

এই তুষার প্রবাহের শুভ্র চড়াই পথটুকু কেবল বাকি, তারপর আমরা উঠে দাঁড়াবো আজ কালিন্দী খালের শেষ প্রান্তে, ১৯,৫১০ ফুট উচ্চে!

স্বামীজী থামতে ইঙ্গিত করেন। বলছেন—কালিন্দীখালের চড়াই উঠবার আগেই নাস্তা খেয়ে নেব! ওদের বলে দিয়েছি। ওরা ওখানে চা বানাচ্ছে।

চায়ের নামে বেশ উৎসাহ বোধ করছি সবাই। কিন্তু কোথায় ওরা? ওদের কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না? চলবার পথে, আজ, বিশাল তুষারপ্রান্তর সম্মুখে পেয়ে যে যার খুশীমত পথে চলেছে। এখন এখানে সকলেরই একত্র হবার কথা। চা তৈরী করার কথা। আমাদের জন্য কই কেউ তো চা বানিয়ে বসে নেই?

দুটি অচলমূর্তি সম্মুখে পাহাড়ের পাথরের উপর উঠে বসেছিল। ওদের দুজনাকে দেখে আশান্বিত হই, ভাবি ওরাই বুঝি চা বানাচ্ছে। আমাদের এগোতে দেখে ওরা নেমে এলো।

স্বামীজী ত্বরিত পদে এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছেন। দূর থেকে আমাদের কর্ণগোচর হয় না। হি, হি, করে হাসতে হাসতে ফিরে এসেছেন, বলছেন—

"আজ একদম উপর্ যা কর্ চা পিয়েগা। উ লোগ্ সব্ উপর চলা গিয়া। মালুম হোতা কেয়া,,উপরই উ লোগ্ চা বানায় গা!"

বলেই আবার দুলে দুলে হাসি শুরু করেছেন।

কোন্ পথে গেল ওরা? আমরা কেউ তো ওদের দেখতে পেলাম না, চারিদিকে তুষার ধব্‌ধব্ করছে, তার মাঝখান দিয়ে ক'টি বিন্দু আমাদের আকণ্ঠ তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির সামগ্রী নিয়ে কখন যেন আমাদের এড়িয়ে উঠে গেল, টেরই পেলাম না আমরা!

কি আর করা যায়! অগত্যা চায়ের আশা পরিত্যাগ করে চড়াই উঠতে শুরু করে দিই। এই তো এইটুকু মোটে পথ, ওই তো তুষার পথের শেষ দেখা যাচ্ছে। কতোটুকু সময়ই বা লাগবে আর! ওখানে উঠেই না হয় চা খাবো। এখন দু'টুকরো চকোলেট খেয়ে নিই!

কিন্তু আমাদের বুঝবার মধ্যে মস্ত ভুল রয়ে গেছে। পাহাড়ের দেশে দূরত্ব বোঝা সহজ নয়, অন্ততঃ সমতলের অধিবাসীর পক্ষে তো নয়ই। তার উপর এ পথের কঠিনতম চড়াই উঠছি আজ।

কি কঠিন পথ! দম থাকে না। উচ্চতার জন্য আমরা দম পাচ্ছি না। দু'পা তিন পা চলেই থামতে হচ্ছে। ক্রমাগত ফাটল পেরিয়ে, জলধারা এড়িয়ে স্বামীজী ও দিলীপ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। বীর্ সিংও চুপ করে নেই। হাল্কা দেহ ওর, অবলীলাক্রমে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবার সামর্থ্য আছে, নিঃশব্দে সাথে সাথে চলেছে, প্রয়োজন মত সাহায্য করছে।

উঁচু ঢাল বেয়ে তুষার নেমে এসেছে। প্রথম যখন বারিবর্ষণের মত তুষারপাত হয়, তখন সর্বত্র সমানভাবে তুষারে ঢেকে যায়। কিন্তু ক্রমে পাহাড়ের ঢালু গায়ের তুষার গড়িয়ে উপত্যকাতে নেমে আসে। কালো পাহাড় আবার নগ্নরূপ ধারণ করে। এখানে দুটি শৃঙ্গের উপর পতিত তুষার গড়িয়ে মাঝখানের উপত্যকাতে বেয়ে নেমেছে। আমাদের এখানকার পথের ঢাল বেশী,. তাই এপথে ফাটলও বেশী। চড়াই-এর শুরুতে আমরা হিম-স্রোতের মাঝামাঝি দিয়ে চলছিলাম। শৃঙ্গ দুটির কাছ দিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, বাঁদিকের শৃঙ্গের উপর থেকে সূর্যোত্তাপে তুষার গলে বালি-পাথরের সঙ্গে ঝর্‌ঝর্ করে পড়ছে। ডান দিকের পাহাড়টি চিরন্তন তুষারে আচ্ছন্ন। এখনকার পথ স্বভাবতঃ ঢালু বেশী বলে, ফাটলের সংখ্যাও বেশী হবার সম্ভাবনা।

তবু কয়েকটি ছোট ছোট ফাটল লাফিয়ে পার হয়েছি। কয়েক জায়গায় পা রাখবার মত পথ কেটে কেটে নিয়ে গেছে দিলীপ। একটি ফাটলের ধারে এসে থেমে গেছে।

"বহিনজী, দেখো তো পার হোনে সেকেগা কেয়া।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় পার হতে পারবো।"

সশঙ্ক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে দিলীপ। আমার আজকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি সর্বাগ্রে চলেছি। মনে অদ্ভুত একটা উৎসাহ, উদ্দীপনা জেগে উঠেছে। ভয়? ভয়কে বুঝি ফেলে এসেছি গোমুখে ভাগীরথীর পদতলে। ভয়ত্রাতা শঙ্করের আশীর্বাদও যে পেয়েছি আমরা সেখানেই।

মস্তবড় লাফ দিয়ে পার হতে হচ্ছে। দিলীপ হাত এগিয়ে দিয়েছে, ওপার থেকে। Ice-axeটি তুষারে গেঁথে নিজেকে আটকে রেখেছে সে।

ছেলেরা সবাই সহজেই পার হয়ে এসেছেন, তাদের জন্য অত ভাবতে হয়নি।

এইভাবেই এগিয়ে চলা। উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন স্বামীজী, থেমে গেছে দিলীপ। একটু এগিয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করে ফিরে এসেছে। তুষারের মধ্যে ফাটলের সংখ্যা অগণ্য, সেগুলি বড় বড় চওড়া ও গভীর। এ পথ পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

আমরা বাঁদিকের কালো পাথরে গড়া পাহাড়ের কাছে এগিয়ে গিয়েছি। সেদিকে ফাটল অনেক কম, কিন্তু তুষারগলা জলের ঝরনা নেমেছে পাহাড় বেয়ে বেয়ে। তাই পাহাড় থেকে চার পাঁচ হাত ব্যবধান রেখে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

তবু চলা কঠিন। অক্সিজেন অভাবে দম পাচ্ছিনা, তাই অসম্ভব ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। এইটুকু মোটে পথ, তাও যে শেষ করতে পারছি না। পথের পাশে বসবার যোগ্য বড় পাথর পেলেই বসে পড়ছি। আঁজলা আঁজলা জল খাচ্ছি, হাতের কাছে জল না পেলে মুঠি করে তুষার মুখে পুরে চুষছি।

অবশেষে পথের শেষ হোলো। শ্রান্ত ক্লান্ত আমরা কালিন্দী গিরিবর্ত্মের শেষ প্রান্তে উঠে দাঁড়ালাম!

না-না, উঠে তো দাঁড়াইনি। কোনক্রমে এসে বসে পড়েছি! শুয়ে পড়েছি! পাথরকে বালিশ করে, পাথরের শয্যাতে শুয়ে পড়েছি সবাই।

অসম্ভব ক্লান্ত আমরা। খানিকক্ষণ শুয়ে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে তবে উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেলাম আমরা!

স্তম্ভিত, বিস্মিত আমরা! সম্মুখে অপূর্ব দৃশ্য, এ যে কল্পনাতীত!

তুষারপ্রবাহ বেয়ে উঠে এসেছি আমরা। সেই প্রবাহ অকস্মাৎ এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে। তারপরই খাড়া পাহাড়ের অসমতল প্রাচীর অপর দিকে বহু নীচে নেমে গেছে। দুদিকে দুটি শৃঙ্গ। একটি সম্পূর্ণ তুষারাবৃত শুভ্র (২১,১৪০ ফুট), অন্যটি (২০,০২০ ফুট) পিরামিডাকৃতি, তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট—কৃষ্ণবর্ণ।

দূর দিগন্তে ঘিরে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সারি সারি তুষারশৃঙ্গরাজি। হিমালয়ের কতো বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ আমাদের সম্মুখে। তারই মাঝে মানা ও কামেট। পর্বতশৃঙ্গগুলি এবং আমাদের মাঝখানে পাঁচশো কি ছশো ফুট নীচে রয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল শুভ্র-তুষার-প্রান্তর—"অরোয়া-তাল"। তার ঢাল দক্ষিণদিকে, ধীরে ধীরে নেমে গেছে বহুদূরে। অরোয়া নদীর জন্ম হয়েছে আরও দূরে, আরও নীচে—ওই শুভ্র-তুষার-প্রান্তরের তুষারগলা জলে।

চারিদিকে শুভ্র তুষার প্রান্তরের আচ্ছাদন! যেদিকে তাকাই, কেবল শুভ্রতার ছড়াছড়ি। কৃষ্ণবর্ণ পর্বত শিখরে, তার গায়ে, পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে, নীচে উপত্যকাতে—সর্বত্র শুভ্র তুষার ধব্ ধব্ করছে!

অলৌকিক রূপের সমারোহ!

যেন শুভ্র নিষ্পাপ দেবলোকে পৌঁছে গেছি আমরা, মর্ত্তের মানব! সুখ-দুঃখ-বিজড়িত পৃথিবী ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধলোকে উপস্থিত হয়েছি।

মনে এক প্রশান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে!

দেহবোধ যেন লোপ পেয়ে গেছে!

দিব্য-ভাবে আমাদের সর্বসত্তা আচ্ছন্ন!

অপলক নেত্রে নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

হঠাৎ যেন সুপ্তি ভঙ্গ হয়েছে। অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি সবাই। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ছবি,—ছবি তুলে রাখতে হবে। স্বর্গপুরীর ছবি আমরা হৃদয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যাবো ছবিতে ধরে, তুলে ধরবো আমাদের চোখের সামনে। দেখাবো দুনিয়ার সব মানবকে, কি স্বর্গীয় আনন্দের আমরা অধিকারী আজ। তারই ভাগ দেবো তাদের।

সূর্যালোকে চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করছে। তুষারে তুষারে প্রতিফলনের আলোর স্বর্গীয় খেলা, সে যে ক্ষণিকের, সূর্যদেবের সাথে সাথে সেও যাবে মিলিয়ে—ঘন অন্ধকারে চারিদিকের আনন্দরূপ যাবে ঢেকে।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সবাই। স্বামীজীর হাতে ক্যামেরা, দাদার হাতে ক্যামেরা, ওঁর হাতে ক্যামেরা। মেজর সাহেব ওঁর সাথে সাথে আছেন। সবাই ছবি তুলছেন। আর আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আচ্ছাদিত, চোখে গগল্‌স্‌ পরা, মাথা মুখ পর্যন্ত ঢাকা বালাক্লাভাতে, আমি, দিলীপ ও স্বামীজীর সাথে ওদের ইচ্ছেমত স্থানে দাঁড়াচ্ছি—ছবি তোলা হবে যে আমার! কালিন্দী খালের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তোলাচ্ছি!

হাসিতে, খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছি আমরা! কয়েকটি মানবশিশু আমরা, আমাদের প্রিয় হিমালয়ের ১৯,৫১০ ফুট উঁচুতে উঠে খেলাতে মত্ত হয়ে গেছি!

কিন্তু, কিন্তু,—হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এইভাবে "হ্যাঁ।" সত্যেনবাবু বলছেন,—"আসুন, একটু কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্‌।"

"ঠিক, চা! চা কই? বীর সিং?" সবাই একসাথে চেঁচিয়ে ডাকছি।

তাইতো! হঠাৎ যেন অসম্ভব দুর্বল বোধ করছি সবাই। আমরা আজ সমস্তদিন কিছুই খাইনি তো! কেবল তুষারগলা জল, আর জল জমা তুষার—এই দুটি পদার্থ ছাড়া আর যা জুটেছে তা হ'ল, দু'এক টুকরো চকোলেট, আর দুটো একটা লজেন্স বা মিছ্‌রীর টুকরো।

বেলা তিনটার সময় কালিন্দীখালে পৌঁছেছি। আমরা যে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছি, সেকথা পর্যন্ত আমাদের এতক্ষণ খেয়াল হয় নি! চা চেয়ে উত্তর পেলাম, "চা তো আভি বনায়া নেহি।"

"তবে জলই দাও—কিছু খেয়ে তো নিই।"

বীরসিং অতি সহজভাবে জবাব দেয়—"পানি ইধর কিস্তরফ্‌ হ্যায়?"

জল চাই! চা চাই! খাবার চাই!

দিলীপ বিব্রত হয়ে পড়েছে। এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে সবাইর।

এই রাজ্যে সবই তুষার। খাবার জল নেই, তুষার গলানোর উপায় নেই, চা করবার উপায় নেই, কেননা আগুন জ্বালাবার একমাত্র উপায়

ষ্টোভটি এসে পৌঁছায়নি। আমাদের তাঁবু এসে পৌঁছায়নি। যে কুলিরা আমাদের তাঁবু নিয়ে চলছিল, তারা এসে পৌঁছাতে পারেনি। যারা এসেছে, তারাও নিদারুণ পরিশ্রান্ত। তাদের মাথা ধরেছে, তারা বমি করছে, অসুস্থ হয়ে কান্নাকাটি করছে। বার কয়েক ডাকাডাকিতে গঙ্গাসিং মুখের চাদর সরিয়ে হু হু করে কাঁদছে আর বলছে—"

"মর গিয়া মাইজী, একদম মর গিয়া।" তার হাসি, গান আজ চোখের জলে রূপান্তরিত। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে মাথা মুখ ঢাকা দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

স্বামীজী দিলীপকে সাথে নিয়ে তাঁবুর জায়গা ঠিক করে নিচ্ছেন। আজ আমরা কালিন্দীখালের উপর রাত কাটাবো। উত্তরদিকের পাথর ছড়ানো শৃঙ্গের (২০,০২০ ফুট) গায়ে অসমতল পাথর-স্তূপ সমান করে নিয়ে তার উপর আজ রাতের মত আমাদের তাঁবু লাগানো হবে।

সাড়ে চারটা বেজে গেছে। বাকি কুলিরা এখনো তো নীচ থেকে উঠে এলো না! একজনকে অনেক কষ্টে উঠে আসতে দেখা গেল, সে এসে জানালো, বাকী দু'জন নীচে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বোঝা নামিয়ে রেখে বসে তারা কাঁদছে। ওদের মধ্যে একজন হ'ল হরচাঁদ।

বীরসিং প্লাষ্টিকের বালতি হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেছে। খানিকটা নীচে পাহাড় থেকে বরফগলা জলধারা পাওয়া গেছে, সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে এনেছে। পরম আকাঙ্ক্ষিত, উপাদেয় তৃষ্ণার জল এনে এগিয়ে দিচ্ছে আমাদের মুখের সামনে। স্বামীজীর তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে, তার মধ্যে স্টোভে চায়ের জলও বসে গেছে।

নীচে নেমে গেছে দিলীপ। পাহাড়ী রীতিতে গালিগালাজ করবে নীচে ক্রন্দনরত পাহাড়ীদের। বলবে, বাবুজীদের তক্‌লিফ্ দেওয়া চলবে না। জান্ যায় যাক্, তবু উপরে উঠে আসতেই হবে। এইরূপ নানা কথা বলে, ওদের মনোবল দৃঢ় করে উপরে তুলে আনতেই হবে। নইলে ওখানে তুষারের মধ্যে আশ্রয়হীন অবস্থায় ওদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। আর আমাদের অবস্থা যা হবে, সে কথা নাই বা বললাম!

দীর্ঘ প্রতীক্ষাময় একটি ঘণ্টা! দিলীপ এলো, দেখালো তার পিঠে সে দুটি তাঁবু বয়ে এনেছে। পিছন পিছন দুটি প্রাণী যেন হামাগুড়ি দিয়ে

চার-হাত-পায়ে উঠে আসছে। তাদের বোঝা হালকা হয়েছে, উপরে উঠে আসা তাই সম্ভব হয়েছে।

রাশভারী দিলীপ। তাকে ওরা যেমন ভয় করে, তেমনি সম্ভ্রম করে, ভালও বাসে।

খুব জোরে হাওয়া বইছে। চাদর মুড়ি দিয়ে পাথরের উপর বসেছিলাম। তাঁবু লাগানো হতেই সকলে ভিতরে ঢুকে পড়েছি। বাইরের দৃশ্য ছেড়ে বদ্ধ তাঁবুর ভিতর ঢোকা কঠিন—কিন্তু রৌদ্র কমতেই প্রচণ্ড শীতে যেন হাড়ের ভিতর অবধি কাঁপতে শুরু করেছে। তবুও মনে বেশ একটা পরিতৃপ্তি বোধ করছি। দেহ ক্লান্ত হলেও আনন্দরসে সবাইর মন ভরপুর।

## কালিন্দীখালের উপর--অরোয়া-তাল

২৪শে জুলাই। কাল রাত কাটলো মন্দ নয়। নিঃশ্বাসের কষ্ট হলেও, সকলেই বলছি, বেশ ঘুমিয়েছি সবাই। ঠাণ্ডার ভয়ে সবগুলি গরম জামা-কাপড় পরেই স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছিলাম, মোজা বালাক্লাভা শুদ্ধ। এছাড়া আমাদের চারজনের শারীরিক গ্লানি কিছু বিশেষ নেই। আমার মাথা সামান্য টিপ্‌টিপ্‌ করছিল, কাল চায়ের সাথে aspirin খেতেই সেরে গেছে।

বেলা একটু বেশী হতেই সকলে তাঁবু ছেড়ে বের হয়েছি। অপূর্ব সুন্দর স্বচ্ছ প্রভাত নীলাকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, চারিদিকের শুভ্র তুষারের উপর আলোছায়ার লুকোচুরি। সূর্যকিরণ কোথাও পড়েছে, কোথাও এখনো পড়তে দেরী আছে। সাদা তুষারের গায়ে এখানে ওখানে নীলাভ ছায়া লেপ্‌টে আছে। অদ্ভুত এক মায়ালোক সৃষ্টি হয়েছে!

আজ এখনি এমন স্বর্গপুরী ছেড়ে যেতে হবে, মনে একটু দুঃখ, একটু নিরাশার ভাব জেগে উঠেছে, সবাইর মনই আজ একটু ভারাক্রান্ত। তবু একবার সকলে একসাথে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমাদের রাতের আশ্রয়দাতা পর্বতশিখরের সম্মুখে আমাদের ছবি তোলা হবে।

"বহিন্‌জী।"

"কি খবর হরচাঁদ? কেমন আছ আজ?"

"বহুৎ ভুখ্‌ লাগা, বহিনজী! কল্‌তো হামলোগ্‌ খানা পাকায়া নেই, কুছ খায়া ভি নেহি! ক্যায়সে খায়েগা? আভি বহুৎ ভুখ লাগা। লেকিন খানেকা কুছ্‌ হায় ভি নেহি।"

"অ্যাঁ, বলো কি হরচাঁদ? কাল খাওনি কিছু? চলো, আমাদের কাছে চিঁড়ে আছে, তাই দিচ্ছি। তোমরা তাই সকলে ভাগ করে খেয়ে নাও।"

খুশীতে হরচাঁদের দাঁতের সোনা ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে। চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে হাসিতে। প্রত্যাশা নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য পাহাড়ীরা

তাদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হরচাঁদ হাসিমুখে ওদের দিকে তাকায়। যেন বলে,—কেমন, বলেছিলাম কিনা! বহিন্‌জী সাথে থাকতে আমরা না খেয়ে থাকবো?

আজ আমাদের কেবল নীচের দিকে নামবার পালা। গিরিবর্ত্মের অন্য পাশে কালিন্দী পর্বতের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে আমরা চলা শুরু করে দিয়েছি। খুসীতে যেন নাচতে নাচতে পথ দেখাচ্ছেন স্বামীজী, তাঁর পাশে ক্যামেরা কাঁধে উনি রয়েছেন। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে চলে নীচের দিকে নামবার পথ কঠিন বরফের উপর নরম তুলোর মত পুরু আস্তরণ, চলতে চলতে সবাই হাঁটু অবধি ডুবে যাচ্ছি। দিলীপ আমাদের আগে আগে এগিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ওদেরও মাঝে মাঝে নরম তুষারে পা ডুবে যাচ্ছে। মন আমাদের হালকা, শরতের জলহীন শুভ্র মেঘের মত নীলাকাশে আনন্দের পাখা মেলে যেন উড়ে চলেছে। হাসতে হাসতে চলেছি সকলে। বহুদিন পর হরচাঁদ আজ আবার তার বহিন্‌জীর পাশে পাশে চলতে পারছে, তাই তার আর খুসীর অবধি নেই।

কিছুদূর চলার পর একটা খাড়া উৎরাই-এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। পাথর-বালি ছড়ানো সামান্য হেলানো দেয়াল যেন! এতদিন পাথরে, পাথরে, বরফে, বরফে, চলে চলে এমনি খত্‌রা পথে চলাটা অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলেছি। ধীর অবিচলিত পদক্ষেপে আমরা অধোগামী হতে শুরু করেছি।

ঝুরঝুরে বালি। চলতে গেলে পা ফস্‌কে যায়। হুড়হুড় করে চলতে থাকি, তা হোক্, পা'কে তার ইচ্ছেমত চলতে দাও, পড়ে না গেলেই হ'ল। নীচের ওই বড় পাথরটা লক্ষ্য করে চলেছি, ওটার কাছ পর্যন্ত এমনি হড়কাতে হড়কাতে নেমে যাবো। বাঃ, বেশ তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছে তো, যেমন করে পাহাড়ীরা ধসা পাহাড় বেয়ে নামে, তারই অনুকরণ করছি।

দিলীপ বক্‌ছে। বক্‌ছে আমাকে।

"কেয়া করতা বহিন্‌জী? ধীরে ধীরে চলো।"

দুষ্টু ছোট মেয়ের মত হেসে উঠেছি—"কেন? বেশ তো নামছি!"

অস্বীকার করতে পারে না দিলীপ।

"লেকিন্ দেখো, উধর্ নীচে সামনেমে মেজর সাব্ হ্যায়, পত্থর গির্‌কে উন্‌কো চোট্ লাগে গা।"

"তা তোমার মেজর সাহেবকেই বলো না হঠে যেতে—পাথর গড়ালে আমি কি করবো ?

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাতে শুরু করেছি—"ও মেজর মহারাজ ! সরে যান, সরে যান—পাথর গড়াচ্ছে কিন্তু !

মেজর সরে দাঁড়িয়েছেন। তার পাশ দিয়ে হাসির ফুল্‌কি ছড়াতে ছড়াতে নেমে চলেছি।

"ওঃ, ভারি খুসী যে আজ দেখ্‌ছি।"

খুসী আমরা সকলেই। মেজর সাহেব নিজেও হাসছেন, দাদা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন, নীচে সুন্দরানন্দজী হাসছেন দুলে দুলে। চারিদিকের তুষারাচ্ছাদিত পাহাড় খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। খুসীর বন্যা ছড়িয়ে পড়েছে দিগ-দিগন্তে ! আমাদের খুসীর দলে আজ একজন কেবল বাদ রয়ে গেছে। আমাদের আনন্দে সে যেন মন খুলে যোগ দিতেও ভয় পাচ্ছে। চারিদিকের শুভ্র তুষার দেখে, তুষার ভয়ে ভীত দিলীপের বুঝি 'বুখারই' এসে গেল। তার মুখে ভয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। এতগুলি উচ্ছল ছেলেমানুষকে নিয়ে সে যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে। তার উপর সে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছে। কিন্তু খাবার জল কোথায় এখানে ? এখানে সবই যে কেবল তুষার ! দিলীপ খুঁজে খুঁজে হয়রান, শেষে হাত দিয়ে বালি পাথরের দেয়াল খুঁড়ে ছোট্ট একটা গর্ত তৈরী করেছে। আশপাশের বরফ থেকে চুঁইয়ে জল এসে তাতে জমছে। দেয়ালের গায়ে দুই হাত দিয়ে দেহ সামলে রেখে সে উপুড় হয়ে মুখ লাগিয়ে সে জলটুকু তৃষ্ণার্ত প্রাণীর মত চুষে চুষে খাচ্ছে !

নীচের তুষার প্রান্তরে বেশ সহজেই পৌঁছে গেছি। আবার একটু এগিয়েই দেখি আরও একটা উৎরাই। আমাদের দলবল দুশো, আড়াইশো ফুট নীচে একটা তুষারের ময়দানে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের একপাশে দাদাও বসে আছেন। কিন্তু,—ওরা ওখানে নামলো কি করে ?

ওমা, তাইতো, এইতো পিছলে যাওয়ার দাগ রয়েছে বরফের উপর দিয়ে, বরফের দেয়াল বেয়ে। ওরাও নীচে থেকে চেঁচাচ্ছে, হাত নেড়ে কালো কালো বিন্দুগুলি কি যেন বলছে। দূরত্ব বেশী বলে ওদের কথা শোনা যাচ্ছেনা। কিন্তু ইসারা করা দেখে বুঝে ফেলেছি এবার। বরফের দেয়াল বেয়ে ওরা glissade

করে নেমেছে, আমাকেও অমনি করে নামতে বলছে। দাদার কথা যেন একটু একটু শোনা যাচ্ছে—

"নেমে এসো, বসে বসে নেমে এসো।"

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। ইসারা করে প্রশ্ন করি, "বসবো?"—"হ্যা" এবার চিৎ হয়ে শুয়ে নামবো?

কিন্তু, দিলীপ বড় শক্ত ঠাঁই। ও কি হচ্ছে?

"ঠাহ্‌রো বহিন্‌জী! এইসা উৎরানা নেহি! হরচাঁদ nylon rope নিকালো"। ততক্ষণে আমি বসে পড়েছি বরফের উপর। হরচাঁদ তাড়াতাড়ি আমার কোমরে দড়ি বেঁধে ফেলেছে।

অমনি করে পিছলে নামা বিপজ্জনক। যদি অভ্যাস না থাকে, তবে উল্টে পাল্টে গেলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, গতিবেগে বেঁকে গেলে কিছুদূরে বরফের ফাটলে অদৃশ্য হবার আশঙ্কাও আছে। সতর্ক দিলীপ রশি ধরে তাই আমার গতি সংযত করবে।

—"না, না, না" আমি চেঁচাচ্ছি, "আমি ওদের মত করে নামবো।"

নামতে শুরু করেছি। হাত পা ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে নামছি। আমার চলার রকম দেখেই দিলীপ দড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আর আমাকে পায় কে? কি আনন্দ করে যে নিচে নেমে এলাম! কত যুগ আগে ছেলেবেলায় পার্কে পার্কে এমনি খেলা খেলেছি। আজ বুঝি অনেকগুলি বছর পিছিয়ে তেমনি আবার শিশুকালে ফিরে গিয়েছি। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে পিছ্‌লে নামছি। দেবভূমিতে এসে আমরা যেন সবাই শিশু হয়ে গিয়েছি।

নীচে পৌছে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, উনি স্বামীজী ও সত্যেনবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁরাও ওই একই উপায়ে এক এক করে নামছেন। আর খুসীতে হাসছেন। মেজর সাহেব নামতে নামতে একবার মাঝপথে বেঁকে গিয়েছিলেন। নীচ থেকে সবাই চেঁচাচ্ছি—"থামুন, থামুন, থেমে সোজা হয়ে নেমে আসুন।"

বাঁকা পথ ধরে নামলে তিনি সোজা একটি তুষার-গহ্বরের ভিতর পড়তেন। আমাদের চেঁচামেচি শুনে যখন বুঝতে পারলেন, কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে, দুটি হাত মাটিতে ঠেকিয়ে গতি সংযত করে নীচের দিকে

তাকিয়ে দেখে সোজা পথে নেমে এলেন। স্বামীজীর একটি বোঝা পিঠে। ওটি বুকে চেপে ধরে তিনি নেমে এলেন।

ওই যাঃ! ছবি তো তোলা হ'ল না!

শুনেই স্বামীজী তাড়াতাড়ি আবার চড়াই বেয়ে খানিকটা উপরে উঠে হেঁচড়ে নামলেন। cinema তোলা হ'ল তাঁর।

কালিন্দীখালের উপর থেকে যে বিশাল শুভ্র তুষার প্রান্তর নীচে দেখেছিলাম, এইভাবে দুটি উৎরাই পেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের পক্ষে সেখানে নেমে আসা সম্ভব হ'ল।

বিশাল তুষার প্রান্তরে পৌছেছি, কিন্তু প্রান্তরটি এখনো ঢালু বেশ।

"উঠো বহিনজী, চলো।"

"উঁহু আমি হাঁটবো না, ওই রকম করে আরও চলবো।"

"বহিনজী, আভি ঐসা করকে চলনেসে আপ্‌কা কাপড়া টুট্‌ যায়গা"— Plastic এর sheet এনে কোমরে জড়িয়ে দিয়েছে হরচাঁদ—"আভি চলো।"

এবার বসে বসে তুষারে হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে চলেছি। কিন্তু এমন ক'রে বেশীদূর যাওয়া চললো না, প্রায় সমতল প্রান্তরে পৌছে গেছি কিনা!

তাই উঠে শক্ত তুষারের প্রান্তরের উপর দিয়ে দক্ষিণদিকে হেঁটে চলেছি। অল্প উৎরাই পথ। মাঝে মাঝে বরফের মধ্যে ফাটল আছে, নীলাভ তুষারে ঢাকা, প্রান্তরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি প্রসারিত। অতি সাবধানে সেগুলি পার হয়ে চলেছি। বড় বড় ফাটলগুলি সযত্নে এড়িয়ে দূর দিয়ে চলেছি। প্রান্তরটি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে গেছে, তাই চলা অনেকটা সহজ হয়েছে।

বেলা বারোটা নাগাদ সকলে মিলে বিশ্রাম করতে বসলাম। চারিদিকে তুষার পর্বত ঘেরা শুভ্রপ্রান্তরের শুকনো তুষারের উপর। উনি ওখানেই শুয়ে পড়েছেন—ওঁর ওই-ই নিয়ম, বিশ্রাম মানেই শয়ন, ও শয়ন মানেই নিদ্রা, তার স্থান কাল নেই!

বিশ্রাম করবার সময় সত্যেনবাবুর formula মাফিক আজ শরীরে তেজ করা হ'ল। কলকাতা থেকেই সত্যেনবাবু বলছেন—

"মধু নিয়ে যাবো কিন্তু, মধুর সঙ্গে বরফ মিশিয়ে খেলে গায়ে খুব তেজ হয়।"

কিন্তু এতদিন সুযোগের অভাবে সে তত্ত্ব আর পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আজ তাই সকলে মিলে তুষারের উপর গোল হয়ে বসে পড়েছি। সকলের হাতে একএকটি তুষারের গোলক, তাতে একটি করে গর্ত। স্বামীজী এক এক চামচ মধু ঢেলে দিচ্ছেন ওই গর্তের মধ্যে। তাই চুষে চুষে খাওয়া। অপূর্ব আস্বাদ! কোথায় লাগে কুল্‌পী-মালাই! স্বামীজী নাম দিলেন, "তুষার-সহদ।" সত্যি কিন্তু, খাওয়ার পর মনে হল যেন দেহে নতুন শক্তি পেলাম।

প্রান্তরের যেখানে বসে "তুযার-সহদ" খাওয়া হচ্ছে, তার সামনেই দূরে, খানিকটা নীচে বেশ বড় বড় দুটো পুকুরের মত। সবটাই প্রায় জমে রয়েছে। ওরই নাম "অরোয়াতাল" ( ১৫,৭৫০ ফুট ), অরোয়া নদীর উৎপত্তি ওই তাল বা হ্রদ থেকে।

বিস্তীর্ণ তুষার-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তির তির করে অজস্র জলধারা বয়ে চলেছে। আশপাশের পাহাড় থেকেও অগণ্য জলধারা নেমে আসছে। যতই নীচের দিকে নেমে চলেছি, একটির পর একটি ধারা একত্র হয়ে বড় একটি জলধারাতে পরিণত হচ্ছে। সবগুলি একত্র হয়ে মিশেছে আরওয়া তাল থেকে নিঃসৃত অরোয়া নদীতে।

অরোয়া তালের তুষার প্রান্তব শেষ হবার কিছু পরেই তুষারের উপর পাথর ছড়ানো একটি প্রান্তর। সেখানে আমবা আজ চা ও নাস্তা খেয়ে নেবো। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা একপাশ দিয়ে শিশু অরোয়া নদী বয়ে চলেছে। সম্মুখে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে একটি ছোট হিমধারা ঝুলে রয়েছে (hanging glacier), তার নীচ দিয়ে আসছে টলটলে স্বচ্ছ ঝরনা। সেটিও এগিয়ে গিয়ে অরোয়া নদীতে মিশে তার জলভার বৃদ্ধি করছে।

চারদিকের পাহাড় থেকে যেমন জলধারা নামছে, তেমনি নামছে পাহাড়ের অংশ। তুষার গলবার সাথে সাথে ছোট বড় নানা আকারের পাথর গড়িয়ে এসে জমেছে উপত্যকাতে। এই স্তূপাকার পাথরের উপর দিয়ে এখনকার চলবার পথ আমাদের। যতই এগিয়ে চলেছি, পথও ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে। পাথরগুলির আকৃতি বৃহত্তর হচ্ছে, তারই উপর দিয়ে দিয়ে চলতে হচ্ছে। খুব কষ্ট করে চলেছি। বিশেষ করে সারাদিন চলবার পর দিনের শেষে পা যেন আর চলে না!

বেশ ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়েছি, কিন্তু দিলীপ ও হরচাঁদ সাথে সাথেই রয়েছে। হরচাঁদের আজ আর "দম ছুটবার" আশঙ্কা নেই, তাই সে তার "বহিনজীর" সাথে থাকতে পারছে। তাই তার আনন্দ আর ধরে না !

পাথরে পাথরে দিলীপ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ওর পাথরের উপর পথ দেখানোর ভঙ্গিটি সত্যই অপূর্ব। বাঁ হাতে ধরা Ice-axeটির ডগা দিয়ে পাথরের মাথায় মাথায় দেখিয়ে দেয়, কোন পাথরে পা রাখতে হবে। এখানকার প্রস্তররাজ্যে পথ প্রদর্শনের কাজে ওর জুড়ি নেই। প্রতিটি পাথর যেন ও চিনতে পারে। তাদের গঠন-বৈচিত্র্য, স্বভাব, স্থিরতা, অস্থিরতা সবই ওর নখদর্পণে।

দিলীপের হাতধরা অর্থ, শক্ত করে হাত ধরা বা টেনে নিয়ে যাওয়া নয়। আলগোছে স্পর্শ ক'রে নিয়ে চলা। আমার সাধ্যমত দ্রুত বা ধীরে চলেছি, যখনই প্রয়োজন হয়েছে তার আলগা মুঠি মুহূর্তের মধ্যে লৌহকঠিন হয়ে উঠেছে। ধরণীর কোলে আশ্রয় নেবার হাত থেকে সেই মুহূর্তে রক্ষা করছে সে। আরও একটি বিশেষত্ব আছে, সে বিশেষত্ব তার চলায়,—ওর পদক্ষেপ ও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, যখন আমি পা ফেলছি, তখন সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওর চলবার মুহূর্তে আমাকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে।

তবু নিজের পায়ের উপর দিয়েই চলাতো ! সকাল থেকে সারাদিন ধরেই প্রায় চলছি, খুবই কষ্ট হয়েছে, দিলীপ দেখাচ্ছে, "ওই দেখ, ওরা আমাদের জন্য বসে আছে।"

আশান্বিত হয়ে তাকিয়ে দূর থেকে দেখছি, পাহাড়ের বড় বড় পাথরের আড়াল থেকে স্বামীজীর গেরুয়া বস্ত্রাংশ দেখা যাচ্ছে। একটু এগোতেই, এক এক ক'রে সকলকেই দেখা গেল। তাইতো ! ওরা সবাই বসে যে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করছে।

পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে একটা প্রবল স্রোতস্বিনী বয়ে আসছে। তার জলধারা তীব্রবেগে ছুটে চলেছে বিরাট, বিরাট পাথর ডিঙিয়ে। ঝরনার ওপারে পাথরের উপর বসে আছেন, স্বামীজী, দাদা, উনি ও সত্যেনবাবু। আমরা পৌঁছতেই দুপাড়ের মস্ত মস্ত দুটো পাথর দেখিয়ে স্বামীজী চোখের ভুরু নাচিয়ে সহাস্য মুখে ইঙ্গিত করেন,—পার হতে হবে !

কি সর্বনাশ! এখানে পার হবো কি ক'রে? এক পাথর থেকে অন্যপাথরে আমার পা-ই যে পৌছাবে না! থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছি। হরচাঁদ লাফ দিয়ে পার হয়ে গেলো-পিঠে তার বোঝা, স্বামীজী তার হাত ধরে সামলে নিলেন। তাড়া তাড়ি করে তার মাল রেখে, ওদের হাত থেকে দুটো লাঠি চেয়ে এনেছে, পেতে দিয়েছে দুটি পাথরের উপর।

"বহিনজী! ইস্‌কা উপর পায়ের রাখো।" হরচাঁদ হাসিমুখে বলে। দাদা বলছেন, "হরচাঁদ! লাঠি ভাঙবে না তো?"

"নেহি, নেহি, টুটেগা নেহি, ধীরে—বহুৎ ধীরে পায়ের লাগাও ইস্‌কা উপর। কোই ডর্ নেহি!"

মিষ্ট, কোমল, অথচ দৃঢ়স্বরে আশ্বাস দেয়। নীচু হয়ে সে চেপে ধরেছে লাঠি দুটির একপ্রান্ত।

লাঠির উপর দিয়ে পার হলাম না। অখণ্ড বিশ্বাসে ওর নির্দেশমত লাফ দিয়েই পার হয়েছি। ওপারে হরচাঁদ হাত ধরে সামলে নিয়েছে, এপারে এগিয়ে ধরেছে দিলীপ। না পারলে, পাথরে চুরমার হয়ে যেতাম, কেবল তাই নয়, নীচের ওই উন্মত্ত ঝরনার মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে যেতাম! কাছেই প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে দাদা দাঁড়িয়ে আছেন। এখন সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। আর আমার স্বামী পিছন ফিরে বসে, হয়তো স্ত্রীর এহেন অপঘাত মৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে চান না! ওঁরাও লাফিয়েই পার হয়েছিলেন, তাই বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। আরও বুঝেছিলেন আমার পক্ষে কাজটা কতটা কঠিন হবে।

আবার বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে পথ চলেছি। কষ্ট ছাড়া এপথে আর কোন বিশেষত্ব নেই।

আরও ঘণ্টাখানেক চলা। আমি যে আর পারছি না! দূর থেকে দেখছি, পাহাড়ের আড়ালে লাল, হলদে, সাদা তাবুগুলি টাঙানো হয়ে গেছে। আরও দেখছি, অল্পদূরে মেজর সাহেব চলেছেন! দিলীপই দেখাচ্ছে। স্বামীজীর সাথে উনি ও দাদা আগেই পৌছে গেছেন।

অরোয়া নদীরতীরে আজ আমরা রাত্রিবাস করবো।

অসীম ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। তাঁবুর ধারে বিরাট একটি পাথর, বেশ চমৎকার শোয়া চলে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, অথচ রৌদ্রও

আছে। পাথরটার উপর আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। আজ কথা কইবার সামর্থ্যও লোপ পেয়ে গেছে যেন। মনে হচ্ছে, যেন জ্বরও এসেছে। হয়তো অতিরিক্ত ক্লান্তি বশতঃ এমনি জ্বরবোধ।

শুয়ে শুয়ে শুনছি, মেজর সাহেব তাঁর বন্ধুর সঙ্গে উচ্চস্বরে আলোচনা জুড়েছেন। বিষয়বস্তু হ'ল,— এখন বেলা সাড়ে তিনটার সময় এই অরোয়া নদীর জলে স্নান করা সমীচীন হবে কিনা! ওদের মাথা-ঠাণ্ডা করার দলে দাদা নেই। ভাবি, করুক ওরা স্নান, আমিও ওদের দলে নেই।

স্নেহপ্রবণ দাদা, তিনিও আমাদেরই মত নিশ্চয় পরিশ্রান্ত, তবুও তারই মধ্যে সর্বদাই আমাদের লক্ষ্য করছেন। বুঝতে পেরেছেন অবস্থা। তাঁর ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর একখানা ভারি গরম চাদর এনে আমাকে ভালো করে ঢেকে দিয়েছেন। নিজের air-pillow এনে মাথার নীচে গুঁজে দিয়েছেন। আঃ, কি আরাম! কি অপার আনন্দ! চোখ জলে ভরে এসেছে!

উনি ডাকাডাকি করছেন—বিছানাগুলি দেখে শুনে পেতে নাও। দেখে নাও অদলবদল হ'ল কিনা!

আজ আর সাধ্য নেই, আজ বীর সিং যেমন পেতেছে তেমনি থাক সব। আজ আমাদের চলন্ত সংসারের কাজে আমার ছুটি!

# অরোয়া উপত্যকা

সবুজের ছোঁয়া লেগেছে আজকের পথের গায়ে গায়ে। ছোট ছোট অসংখ্য ফুলগাছ ছড়িয়ে আছে অরোয়া নদীর ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। তারই উপর আমাদের রঙিন তাঁবুগুলি পড়েছিল। সম্মুখে, নদীর ওপারের একটা পাহাড় যেন কবে ধসে পড়েছিল; ঝুরঝুরে বালির উপর থেকে নীচ অবধি নেমে এসেছে। নদীর দুই তীরে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলি বড় বড় পাথর ছড়ানো।

আজকের পথ কেবল সবুজ ঘাস, নানা রঙের ফুলভরা ছোট উপলখণ্ড ভরা উপত্যকার মধ্য দিয়ে। খুব মনোরম দৃশ্য! বেশী চড়াই নেই। মাঝে মাঝে দুইপাশের উঁচু পাহাড় থেকে তুষারগলা স্বচ্ছ ঝরনা নেমে এসেছে, মিশছে অরোয়া নদীতে। তার উচ্ছল জলধারা পার হয়ে আমাদের চলবার পথ।

আমাদের জলে পা দিতে দেবেনা সঙ্গী পাহাড়ীরা। ওরাই পিঠে করে ধারাগুলি পার করে দেবে। ওরা একাজে ওস্তাদ। বিশেষ করে আজ হরচাঁদ ভারি খুসী হয়েছে। সে দৌড়ে ওপারে তার বোঝা নামিয়ে এসেছে, আজ সে বহিন্‌জীকে নদী পার করে দেবে। গঙ্গাসিং এসেছে 'ডাক্তার-সাব্' তার পিঠে চড়ে তাকে ভাগ্যবান্ করবেন! সবাই ব্যস্ত আজ, সকলেই তৈরী, কার পিঠে কে কাকে নেবে! কিন্তু দাদা, হতাশ করছেন সবাইকে, জুতো মোজা খুলে নিয়েছেন, নিজেই পার হচ্ছেন। তবে ওরা তাতে মোটেই খুসী নয়, দৌড়ে গিয়ে দাদার হাত ধরে তাঁকে সযত্নে পার করে দিচ্ছে। সত্যেনবাবু চেষ্টা করছেন নিজে পার হতে, ওরা দিচ্ছেনা। অসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে এরই মধ্যে! তাই আমাদের কোন বিপজ্জনক পথে পা বাড়াতে দিতে ওরা নিঃসঙ্কোচে মহা আপত্তি জানাচ্ছে। তুষারশীতল জল পার হতে তাদের পা টুকটুকে লাল

হয়ে উঠ্ছে—দেখাচ্ছে আমাদের। তবু সেই কষ্টটা তারা নিজেরাই করবে, সামর্থ্য থাকতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটতে দেবেনা কিছুতেই!

বিশাল একটি চওড়া উপত্যকা পার হচ্ছি, তার মধ্য দিয়ে অরোয়া-নদী অনেকগুলি ধারাতে বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। বালুময় তটভূমি,—যেন সমতলে নেমে এসেছি আমরা!

খুব আনন্দ করে চলেছি। আজকের পথ দেখছি বেশ সহজ, আর বুঝি কষ্ট করতে হবেনা। মন তাই বেশ প্রফুল্ল। কিন্তু কালরাত্রে অসুস্থতার জন্ম বিশেষ খেতে পারিনি, আজ ফলস্বরূপ কিছুটা দুর্বল বোধ করছি।

দুইদিকে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের ঢেউ, প্রহরীর মত আমাদের সাথে সাথে চলেছে। মাঝে মাঝে তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়, তার উপর থেকে ঝল্‌মলে রুপালি তুষার নীচে অবধি নেমে এসেছে—একেবারে নদীর জল অবধি। নদীর জলে টুকরো টুকরো বরফ ভেসে চলেছে।

সূর্য্য-করোজ্জ্বল দিন। চারিদিকের উজ্জ্বলতায় ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। নদীতীরের বালুকণার উপর লক্ষ লক্ষ হীরামাণিক ছড়ানো, মরকত-রঙের জলস্রোতে সহস্র সহস্র হীরা ভেসে চলেছে!

এমনি সুন্দর অরোয়া নদীতীরের আবহাওয়াব মধ্যে একটি পাথর ছড়ানো ময়দানে আমরা বিশ্রাম করতে বসে পড়েছি। এখানেই আজ চা ও নাস্তা খাওয়া হবে। এই সুযোগে উনি স্নান করতে গেলেন। সাত-আট দিন স্নান করা হয়নি কারুর। সে সুযোগই হয়নি! বেলা বারোটায় রৌদ্রস্নাত নদীজলে পরম পরিতৃপ্তির সাথে স্নান সমাপন করে বরফের টুকরো কামড়ে খেতে খেতে উঠে এলেন। আমাদের জন্য নদীজলে ভেসে চলা বরফকুচি তুলে এনেছেন। ভারি খুসী আজ। আমাদের দুর্গমপথ শেষ হয়ে গেছে, এখন কেবল নদীর উপত্যকা ধরে সহজ পথ!

এখানে চা তৈরী হচ্ছে, কিন্তু দুধ কই? দুধ যে ফুরিয়ে গেছে! কুছ্ পরোয়া নেই, শুধু চিনি দিয়ে চায়ের লিকারই খাবো! আমাদের food department অর্থাৎ খাবারের ব্যাগটা তছনছ করে দেখি, কয়েকটা চকোলেট, এককৌটা মাখন, চিনি, চা এইছাড়া আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। কালকের দুপুরের জন্য কয়েকটা চকোলেট রাখলেই চলবে। আজ বাকিগুলি সবাই মিলে ভাগ করে খেয়ে নিই!

পাহাড়ীরা অধিকাংশই কোনদিন চকোলেট দেখেনি। একমাত্র দিলীপ mountaineer সাহেবদের সাথে ঘুরেছে ; সে জানে। ওরা চকোলেট হাতে পেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে একবার আমাকে জিজ্ঞাসাও করে গেল, 'এগুলি কি তাড়িয়ে তাড়িয়ে একটু একটু করে খাচ্ছে, আর খুসীতে হাসছে। বেশ খেতে কিন্তু!

ইংরিজি ভাষাতে একটা কথা আছে—morning shows the day! অর্থাৎ সকালের আবহাওয়া দেখে দিন কেমন কাটবে তা বলা চলে। তাই ভেবেছিলাম, আজকের দিনটা বেশ ভালো কাটবে। কিন্তু আমাদের আন্দাজ যে ভুল একথা অচিরেই প্রমাণিত হলো। দুপুরের নাস্তা খাওয়ার পরে নদীর ধারের মস্ত একটা বড় ফুলভরা মাঠ পার হয়েই আমরা যে পথে চলা শুরু করলাম, সে যেন বিভীষিকাময়! চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের বরফঢাকা চূড়া, মাঝখান দিয়ে অরোয়া নদী চলেছে, তারই ধার ধরে পথ। পাহাড়গুলির উপর থেকে বড় বড় লক্ষ লক্ষ পাথর গড়িয়ে এসে নদীর তীরে স্তুপাকার করে জমা হয়েছে। তারই উপর দিয়ে এখন আমাদের চলতে হচ্ছে!

পাথর—পাথর—আর পাথর! ক্রমাগত এইই পার হয়ে চলবার পথ। এই পাথরটা টপকে, ওইটা বেয়ে উঠে বা নেমে, আর ঠিক তাক্ করে যে পাথরে ভর দেবো, সেটাতে পা পড়তেই পড়ে গিয়ে বেসামাল হয়ে, আমাদের এখানে ওখানে চোট লাগতে লাগলো। সকলেই তাই অল্পবিস্তর জখম হোলাম।

এরও উপর, কিছু পর পরই, পাহাড়ের উঁচু থেকে ঝরনা নেমে আসছে, আমাদের পথের উপর দিয়ে বয়ে মিশছে অরোয়া নদীতে। এই তীব্র গতিশীল তুহিন শীতল স্রোতধারা পার হয়ে চলবার পথ। আজ আমাদের দুর্ভোগ আর কষ্টের যেন সীমা নেই!

ক্রমাগত চলেছি বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে, আর পদে পদে বড় বড় ঝরনা পার হয়ে। আমরা তো পাহাড়ীদের পিঠে চড়ে নদী পার হচ্ছি। কিন্তু দাদা! দাদার বয়স ষাটের উর্ধ্বে, কিন্তু অসীম ক্ষমতা। আগাগোড়া রাস্তা প্রায় বিনা সাহায্যে হেঁটেছেন—একটা নদীও পিঠে পার হচ্ছেন না। জলের ভিতর আন্দাজ করে পাথরের উপর পা ফেলে পাহাড়ী ঝরনার উদ্দাম স্রোতের মধ্য দিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত তুহিন শীতল জলের ধাক্কা

খেতে খেতে তার সামনে নদীগুলি পার হওয়া খুবই বাহাদুরী! সত্যেনবাবু একবার কেবল নিজে পার হয়েছেন। অন্যান্যবার ওঁর প্রয়াসকে ধমক দিয়ে ব্যর্থ করে দিলীপ সিং পার করেছে। প্রথমবার পার হবার পর, সত্যেনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলছেন,

—"বুঝলেন? জলটা তো ঠিক ঠাণ্ডা মনে হয় না, মনে হয় অজস্র বিচ্ছু অনবরত কামড়াচ্ছে।" বলেই হো হো করে হাসছেন।

দিলীপের ধমক কিন্তু চেঁচামেচি নয়। একবার মেজরসাহেব জুতো-মোজা খুলে, লম্বা প্যান্ট গুটিয়ে একটা নদী পার হবার মুখে জিজ্ঞাসা করছেন—

"দিলীপ সিং, ইস্ নদীকো তরণে হোগা আভি?"

দিলীপ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলো—"হাঁ মেজর সাব।" বলে নিজের পিঠ পেতে দিলো, মেজর সাহেবের জুতো মোজা তুলে নিলো—মেজর পিঠে চড়ে নদী পার হলেন!

কিন্তু এই বড় বড় পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে চলা যে আর আমাদের শক্তিতে কুলায় না! তার উপর, আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে। জুতো পায়ে দিতেই পারছিনা। কিন্তু, তাই বলে ফোস্কাও পড়েনি। দুই বড় বড় ডাক্তার দেখে শুনে রায় দিলেন—"ওই যন্ত্রণা হয়েছে নার্ভের জন্য।" কিন্তু পায়ের নার্ভের জন্য যে আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার উপক্রম হয়েছে! আরও বলেন "ওর কিছু কর যাবে না?" কিছু করা যাবে না তাতো বুঝলাম, কিন্তু চলি কি করে? ডানপায়ে বুটজুতো পরেছি, বাঁ পায়ে জুতো ছেড়ে শুধু একজোড়া মোটা উলের মোজা পরে দিলীপের হাতে ভর দিয়ে চলেছি—লাঠিটাও নেই। জুতো ছেড়ে চলতে অনেকটা সুবিধা হচ্ছে। যন্ত্রণাটা টের পাচ্ছি না। কিন্তু পায়ে বড় কাঁকর ফুটছে—উঃ, আঃ, করতে করতে চলেছি। খুব কঠিন পথ যখন সামনে পড়ছে, তখন আবার মোজাপরা পা পিছলে যাচ্ছে। তাই দিলীপ তখন ঝক্কি নিতে রাজী হচ্ছে না। পথটুকু পিঠে করে পার করা ওর পক্ষে অনেক সহজ, সে তাই-ই করছে। খুব ধীরে ধীরে সকলের পিছন পিছন চলেছি।

স্বামীজীর সাথে ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, একটা পাহাড়ের বাঁক ফিরতেই আড়ালে পড়ে গেছে। দিলীপের সাথে আমি বড় বড় পাথর টপ্‌কে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে সেই বাঁক ঘুরতেই সম্মুখে ওদের দেখতে পেলাম। উঁচু থেকে একটা সরু নীল ঝরনা নেমে এসেছে দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়ের

গা বেয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ছে নীচের স্তূপাকার করা মস্ত পাথরগুলির উপর। তার তলা দিয়ে বয়ে গিয়ে নীচের উপত্যকাতে অরোয়া নদীর উদ্দাম স্রোতধারার সাথে মিশে গেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। স্বামীজী দেয়ালের গায়ে Ice axe দিয়ে পাথর সরিয়ে সরিয়ে পথ কেটে হাত ধরে ওদের ঝরনা পার করে দিচ্ছেন। খানিকটা নীচে দাঁড়িয়ে ওদের ঝরনা পার হবার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে দিলীপ ঘাড় নেড়ে বলে "নেহি, উধরসে নেহি যায় গা—"

বলে আমার হাত শক্ত করে ধরে টেনে নীচের দিকে নামতে থাকে— প্রায় অরোয়া নদীর তীরের পাথর স্তূপের উপর পর্য্যন্ত। সেখানে মস্ত বড় বড় পাথর থাকলেও খাড়া পাহাড়ের দেয়াল নেই। অরোয়া নদীর তীরের সেই পাথরের উপর চলে খানিকটা ঘোরাপথে আমাকে নিয়ে যখন ওদের কাছে পৌছালো, ওরা তো দেখে অবাক। দলের সবচেয়ে দুর্বল মানুষটি তো পিছনে ছিল, আগে এলো কি করে?

কিন্তু আবার পিছিয়ে পড়েছি। ঝরনা পার হবার সময় আমার জন্য ওদের অপেক্ষা করে বসে থাকতে হচ্ছে। কি আর করা যায়! দিলীপের ভাষায় "পত্থর ফিসল্ যাতা হ্যায়"—অর্থাৎ পাথর পিছলে যাচ্ছে!— তা আমার আর দোষ কি! চলাই যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।

আজ আমাদের হিমালয়ান এসোসিয়েশনের শৈলেশদার কথা এখন বার বার করে মনে পড়ছে। উনি এপথে এসেছেন। বলেছিলেন—

"আপনারা একবার গোমুখ যখন গিয়েছেন, তখন কালিন্দীখাল পর্য্যন্ত কষ্ট হলেও ঠিক চলে যেতে পারবেন। কিন্তু অরোয়াভ্যালি, সে পথ অতি বিচ্ছিরি। ওই পথটা আপনারা কিন্তু দুইদিন চলে পার হবেন। নইলে ভারি কষ্ট হবে আপনাদের।"

কষ্ট? তাতো হচ্ছেই কিন্তু আমাদের মন-মেজাজও যে ঠিক রাখতে পারছি না! এই পথ সম্পর্কে বিখ্যাত পর্বতারোহী Frank S. Smythe তাঁর বিখ্যাত বই Valley of Flowers-এ লিখেছেন—"But I for one was in a thoroughly bad temper. Perhaps the stones had something to do with this, for nothing is more trying to the temper than a day spent pounding over loose stones. I have

never forgotten Bently Beaumont's remarks on the subject in 1931 when for two days we marched up the stony floor of the Arwa Valley. Shakespear could not have surpassed him in adjectival or epithetical force on the subject of Stones.'

("কিন্তু, আজ আমার মেজাজ অতিশয় খারাপ ছিল সম্ভবত চলবার পথের পাথরগুলির সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কেননা সারাদিন ধরে ঝুরঝুরে পাথরের পর পাথরে পা টেনে টেনে কষ্ট করে চলার পর মেজাজ ঠিক রাখার মত কঠিন কাজ আর কিছুই নেই। আমরা যখন ১৯৩১ সালে অরোয়া নদীর উপত্যকার প্রস্তরাকীর্ণ পথে দুইদিন ধরে ক্রমাগত চলেছিলাম, সেই সময়কার চলা সম্পর্কে বেন্টলি বোমণ্টের মন্তব্য আমি কখনো ভুলবো না। সেক্সপিয়র পাথর সম্পর্কে তাঁর মত এমন জোরালো বিশেষণপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ!")

নদীগুলির সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এর কোন কোনটি এত গভীর যে ওদের পায়ের সবটাই প্রায় ডুবে যাচ্ছে। একজন একজন করে চললে ভেসে যেতে পারে এই ভয়ে সকলে একত্র জড়িয়ে ধরে পার হচ্ছে—কিন্তু ওদের কষ্টের কথা বুঝাতে দিচ্ছে কই? হাসিমুখে সর্বদাই আমাদের কাছে কাছে রয়েছে।

এইভাবে চলেছি তো চলেইছি। সাড়ে তিনটার সময় দেখি এগিয়ে চলা কুলিরা অরোয়া নদীর তীরে থেমে রয়েছে। পাহাড়ের উপর থেকে একটা সুন্দর নীলজলের ঝরনা এসে নদীতে মিশেছে। তার তীরে সবুজ ঘাসে ঢাকা ফুলভরা ময়দানে ওরা রুটি তৈরী করছে।

আমাদের দেখেই উল্লাসভরে এগিয়ে এল ওরা। আবার মুখে হাসি ফুটেছে, আবার গান গাইছে ওরা।

কি খবর গঙ্গাসিং? পরশু যে বলছিলে, "মর গিয়া?" কি হল, আজ আবার গাইছ? ডেকে জিজ্ঞাসা করি। প্রাণ খুলে হাসছে গঙ্গাসিং।

"ক্যা করনা মাইজী, উধর তো এ্যায়সাই হোতা হ্যায়! লেকিন্, আপলোক্ ধন্য! এইসা কঠিন রাস্তাসে আয়া আপ্‌লোক—ধন্য! ধন্য!"

"ধন্য! ধন্য!" বলে সুরে সুর মিলিয়ে, অন্যান্য পাহাড়ীরা। আমরা

পাহাড়ী না হয়েও যে ভীষণ দুর্গম পথ নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছি, তার জন্য ওরা আমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছে! কিন্তু আমরা কাকে ধন্যবাদ দেবো? আমাদের নিজেদেরকে? না, ভাগ্যবিধাতাকে? না, সাহসী বেপরোয়া স্বামীজী, শক্তিমান্ হৃদয়বান্ দিলীপ ও তার অনুগত অনুচরবৃন্দকে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

আমরা সুন্দর ময়দানটিতে বড় বড় পাথরে হেলান দিয়ে বসে ওদের দেওয়া দুখানা করে গরম গরম আটার রুটি আর ঝাল চাটনি খাচ্ছি। সামান্য টক কি এক বুনোপাতা কুড়িয়ে এনে তার সাথে অজস্র শুকনো লঙ্কা মিশিয়ে চাটনি তৈরী করেছে ওরা। সে যেমন ঝাল তেমনি টক! দাদার আনা ছোট্ট একশিশি মিষ্টি আচার বাকি ছিল, সেটার সংকার করা হল। ওদের মত অত ঝাল আমরা খেতে পারি না। শেষ পর্যন্ত দুধহীন চা দিয়ে আজ রাতের মত খাওয়া পর্ব শেষ হল বলেই মনে হল।

স্বামীজী বলছেন, আরও কিছুদূর এগিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা থাকবার ভালো জায়গা পাবো। এই আশায় আবার পথ চলেছি। কিন্তু একটানা দুই ঘণ্টা চলেও তো কোন ক্যাম্প করবার মত ভালো জায়গাই আমাদের পথে পড়লো না।

প্রাণবন্ত, চঞ্চল, হাস্যমুখ, বেপরোয়া স্বামীজী আমার স্বামীর হাত ধরে ওঁকে প্রায় টেনেই নিয়ে চলেছেন। নদীর ধারে স্তূপাকার করে জমে থাকা অজস্র মস্ত মস্ত পাথরের উপর দিয়ে চলবার পথ। আমাদের ভাগ্যে ভালো পথ নেই! একবার ওঁকে সামলাতে গিয়ে একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে স্বামীজীর হাঁটুর হাড়টা বোধহয় সরেই গেল (dislocation)—সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের দুটো আঙুল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো।

সকলেই স্তম্ভিত! উনি অপ্রস্তুত, বোধকরি বা একটু ভীতই। স্বামীজী চলতে না পারলে, এই দুর্গম পথে স্বামীজীকেই বা কে দেখবে, ওঁকেই বা কে ধরে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?

দিলীপ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে টেনে হাঁটুটা ঠিক করে দিল। দাদার পকেট থেকে ওষুধ ও sticking plaster বের হল। বেঁধে দিতেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বামীজী উঠে চলতে শুরু করলেন—যেন কিছুই হয়নি!

আজ আমাদের চলার আর যেন শেষ নেই। সাড়ে ছয়টা বাজে। কুলিরা এপথ ওদের পক্ষে সরল দেখে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু চলৎশক্তি-রহিত। আপ্রাণ চেষ্টা করেও এগোতে পারছি না। স্বামীজী আমাদের অচল অবস্থা লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি সমতল জায়গায় থামিয়ে রেখে ওঁকে বল্লেন—

"এখানেই আজ ক্যাম্প করবো, পিছনের লোকদের নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর, আমি এগিয়ে গিয়ে কুলিদের ফিরিয়ে আনছি।"

উনি চুপচাপ বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। স্বামীজী একটু দূরে এগিয়ে যেতেই দিলীপের সাথে আমরা বাকী তিনজনা হাজির হলাম। ওঁর কাছে স্বামীজীর প্রস্তাব শুনে দিলীপ ওঁকে বললে—

"এ জায়গা বহুৎ খতরনাক্ হ্যায়, পত্থর গিরনেকা ডর হ্যায়, ইধর ঠাহরণে নেহি সেকেগা।"

সুতরাং এগিয়ে চলো। কিন্তু চলো বললেই তো আর চলা যায় না! সাথে একা দিলীপ। প্রচণ্ড ক্লান্ত চারিটি প্রাণী, তার মধ্যে একটি খোঁড়া। তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। দিলীপ পথ দেখাচ্ছে।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে পাথরের খাঁজে খাঁজে ফুলগাছে স্তবকে স্তবকে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। সে সৌন্দর্য উপভোগ করবার সামর্থ্যও নেই, তবুও মনটা ডেকে বলে, দেখো দেখো, দেখে নাও! আর তো জীবনে এপথে কখনো আসবে না, দুচোখ ভরে দেখে নাও! এই অপরূপ রূপময় হিমালয়কে অবহেলা করে চলে যেও না, তাই হঠাৎ থেমে যাই!

"ক্যা হুয়া বহিন্‌জী?" দিলীপ জিজ্ঞাসা করে।

"ফুল।" বেশী কথা বলবারও সামর্থ্য নেই আর।

"হাঁ জী, বহুৎ কিসিম্ কা ফুল ইধর মিল্‌তে হেঁ। ই দেখো কস্তুরী। ই ফুলকে হামলোক কস্তুরী বলতে হে।" বলে একগোছা ফুল তুলে এনেছে। হালকা বেগুনী রঙের ফুল, অপরূপ রূপের আধার। রূপসী লজ্জায় যেন মাথা নীচু করে রয়েছে।

বলছি, "ফুল তুলো না, ফুল তুলো না। তুললেই ওর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। গাছের ফুল গাছেই থাক। আমরা চোখ দিয়ে দেখি, তাতেই আনন্দ পাবো।"

ওই একমাত্র সান্ত্বনা! পথের ধারে ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নানা রঙের নানা ঢঙের ফুল ফুটেছে। বিভীষিকাময় পথকে সৌন্দর্য্যময় করে তুলতে প্রকৃতির আপ্রাণ চেষ্টার সার্থক রূপায়ণ! দেবভূমিতে দেবপূজার নৈবেদ্য দেবতা নিজেই সাজিয়ে রেখেছেন যে!

পাহাড়ীরা কস্তুরীফুল ছাড়াও আরও নানারকম ফুল গোছা গোছা তুলে মাথার টুপীতে লাগিয়ে নিয়ে চলেছে। ওদের জিজ্ঞাসা করেছি—"ফুল দিয়ে কি করবে?"

"কল্ বদ্রীনারায়ণ কো পূজা দেগা।"

"কিন্তু ও যে নিতে নিতেই শুকিয়ে যাবে।"

"জি হাঁ" এর বেশী কথা ওদের মুখে যোগায় না, তবু তারা দেবপূজার জন্য ফুল চয়নে বিরতও হয় না। যে দেবতার প্রসাদে দুর্গম পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে এসেছি, তাঁর মন্দির পর্যন্ত তাজা ফুল নাই-বা পৌছালো, তাঁকে তো এখানেই নিবেদন করা হোল, এতেই যে তাঁর পূজা হয়ে গেল! সরল মানুষ, তাই এত কথা ওরা বলতে পারেনা।

কিছুদূর চলবার পর দেখি হরচাঁদ ও যোধসিং ফিরে আসছে। তারা এসে বল্লে, সুন্দর একটা জায়গায় তাঁবু ফেলা হয়েছে, একটু এগিয়েই। ওরা আমাদের সাহায্য করার জন্য এসেছে।

যোধসিং আমার ভার নিলে। কখনো পিঠে, কখনো হাত ধরে নিয়ে চলেছে সে। দিলীপ দাদা ও মেজর সাহেবের সাথে চললো। হরচাঁদ ডাক্তার সাহেবের হাত ধরেছে। হরচাঁদের বড অনুকম্পাভরা মন। আমার স্বামীকে বলছে—

"ডাক্‌টার সাব্, কোই ফিকর্ নেহি, আব্ তো চলে আঁয়ে, আউর ক্যা। হম্ আপ্ কো পকড়কে ধীরে ধীরে লে চলেঙ্গে—ফির বীরবলকা এক কহানি ভি চল্‌তে চল্‌তে শুনায়েঙ্গে।"

এই বলে সে শীতের রাত্রে, গলা জলে-পুকুরে-ডুবে থাকা গরীব ব্রাহ্মণের দূরে-জ্বলা-আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে গরম হবার গল্পটা বললো।

ক্যাম্পে পৌছাতে বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে কেবল পাথরের আকারগুলি বোঝা যাচ্ছে, পাতলা কুয়াশার মধ্য দিয়ে আসা চতুর্থীর চাঁদের আব্ছা আলোতে অরোয়া নদীর ধারে সুন্দর সমতল ময়দানে আমরা ক্যাম্পে

পৌঁছে গেলাম। দূর থেকে দেখছি, পাহাড়ীরা জুনিপার গাছ জ্বালিয়ে "ক্যাম্প-ফায়ার" তৈরী করে আরাম করছে। সেই আগুনেই চায়ের জল বসলো। দুধ চিনি অভাবে চা তৈরী হল লবণ ও মাখন সহযোগে, অপূর্ব তার আস্বাদ। আমি আমার অচল হাত পা সেঁকে নিতে ওখানে ওদেরই পাশে ওদেরই কম্বলে বসে পড়েছি। কি খুসী হোল ওরা!

দুর্গম পথের আজ শেষ রাত্রি, কিন্তু স্বামীজী আজকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

# ঘাসতৌলী—মানা—বদরীনারায়ণ

২৬শে জুলাই। সকালে উঠে আমাদের ক্যাম্প করবার স্থানটি দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কাল অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারিনি। প্রায় চৌদ্দ কি সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে ময়দানটি, ফুলে ফুলে ঢেকে আছে। পাশ দিয়ে অরোয়া নদী ভীষণ গর্জন করে বেগে ছুটে চলেছে। দুইদিকে পাহাড়ের সারি নদীর ধারার পাশে পাশে চলেছে।

তাঁবু গুটিয়ে গোছ গাছ করে রওনা হতে বেশ বেলা হয়ে গেল। পায়ে ব্যথা সকলেরই, তবু সমতল ময়দানের উপর দিয়ে হাঁটতে ভালই লাগছে। অপরূপ রূপের মেলা! ছোট ছোট নানারঙের পাথর ছড়ানো সবুজ এর মধ্যে গোলাপী, হলদে, নীল বেগুনী, সাদা রঙের ফুল সাজানো। স্বচ্ছ অরুণালোকে চারিদিক ঝলমল করছে। শিশির সিক্ত ধরণী যেন নব আভরণে সেজেছে।

একঘণ্টা চলবার পর দেখি, অপরপারে দূরের দুটি উঁচু পর্বত শৃঙ্গের মাঝখান দিয়ে উদ্দাম বেগে সরস্বতী বয়ে আসছে। আমরা ঘাসতৌলীতে এসে গেছি। এখানে সরস্বতী ও অরোয়ার সঙ্গম। আরও একটু এগিয়েই একটা নীল ঝরণা পার হলাম। সেও কলস্বরে অরোয়াতে মিলতে চলেছে, যেন আর সবুর সয় না!

ফুলে ফুলে পাহাড় ছেয়ে আছে। ঝরনার স্বচ্ছ নীল জলধারা ছোট ছোট ফুলগাছ ঘিরে ঘিরে বয়ে চলেছে। বড় বড় পাথর জলের উপর মাথা জাগিয়ে আছে, তার প্রতিবিম্ব পড়েছে নীলঝরণার নীল জলের স্বচ্ছ আরসীতে। এগুলির উপর পা ফেলে পার হয়ে আমাদের চলবার পথ। আচ্ছন্নের মত পথ চলেছি। লোকালয়ের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছি, পায়ে চলা পথের চিহ্ন তাই নজরে পড়ছে।

আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা ঘাসতৌলীর (১৩,১১০ ফুট) ময়দানে পৌঁছে

গেলাম। ওপারে সরস্বতীর তীর দিয়ে উত্তর তিব্বতের দিকে মানা-পাস্ এর রাস্তা গেছে। আগে এই পাস্ দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য চলতো। তিব্বতী পশম ও পশমজাত দ্রব্য, পাথুরে লবণ, ভেড়া, সোহাগ ইত্যাদির পরিবর্তে ভারতীয় শস্য, কাপড় চোপড়, এবং অন্যান্য সৌখীন দ্রব্যাদি আনা নেওয়া চলতো। এখন তিব্বত চীনের অধীনে যাওয়াতে এপথ বন্ধ হয়ে গেছে। ঘাসতৌলীর মাঠে সীমান্ত রক্ষার জন্য পুলিশের লোক ক্যাম্প করে আছে। পাহাড়ের নীচে সবুজ ময়দানে সারি সারি তাদের খাকি রং-এর তাঁবুগুলি। বদরীনারায়ণের পথে এদিক থেকে এই প্রথম গ্রাম। গ্রামের ঘরবাড়ী তো কোথাও দেখছি না, গ্রামবাসীও না। কেবল একদল ভেড়া কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেলাম।

P. A. C. র কর্তা এক সুবাদার সাহেব নিজে এগিয়ে এসে আমাদের permit পরীক্ষা করে দেখলেন এবং রাস্তা থেকে আমাদের ডেকে তাদের ক্যাম্পে বিশ্রাম করতে নিয়ে গেলেন। ঠাণ্ডাজল ও প্রচুর চা পানে আপ্যায়িত করলেন। গত মহাযুদ্ধে চার বৎসর ইনি বন্দী হিসাবে ইটালীতে থেকেছেন। মেজর সাহেবের সঙ্গে এ সম্পর্কে অনেক গল্প হল। তিনি নিজেও প্রায় এক বছর ইটালীতে শত্রু শিবিরে বন্দী ছিলেন। দেখা গেল, ওরা প্রায় একই সময়ে মুসোলিনীর অতিথি ছিলেন!

এখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আবার "বদ্রীবিশাল কি জয়!" বলে পথ চলা শুরু করলাম। বদরীনারায়ণ ধাম (১০,২৪৪ ফুট) এখান থেকে এখনো দশ মাইল দূরে। তবে এখন ভাল চলার পথ আছে। মানুষের হাতে তৈরী পথ দিয়ে আজ নয়দিন পর চলেছি, কখনো উঠছি কখনো নামছি, তবে বেশীর ভাগই উৎরাই পথ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লাল পাথরের রাস্তা। তিব্বতের মালভূমির তামাটে লাল রং যেন এখানে থেকেই শুরু হয়েছে। আগাগোড়া রাস্তার দুধারে নানারঙের ফুল ফুটে আছে। চলতে চলতে একটা বড় পাথরের ধারে বিশ্রাম মানসে দাঁড়িয়েছি, দেখি কালো পাথরের আড়াল থেকে ব্লু-পপি উঁকি দিচ্ছে। ভাবখানা—"আমায় কি চিনতে পারছ? মনে কি পড়ে, কখোনো আমায় দেখেছ বলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! তুমিই তো শিখতীর্থ হেমকুণ্ডের দুর্গম পথে হাসিমুখে আমাদের আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলে! তোমার নীলাকাশের বুকের মধ্যে

তপন শোভিত রূপের শোভা নিয়ে ওইখানেই থাকো তুমি, ওগো সুন্দরী! তোমাকে তাই তো Smythe নামকরণ করেছেন "Queen of the Himalayas!"

এদিকে তাকিয়েছি—"ছুঁয়োনা আমায়" লজ্জাশীলা কস্তুরী তার মুখখানি ঘোমটায় ঢেকে মাথা নীচু করে রেখেছে! অপূর্ব দৃশ্য, এখানকার!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘাসে ঢাকা মাঠ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের উঁচু থেকে স্বচ্ছ সলিলা ঝরনা নেমে এসে বয়ে চলেছে পথের উপর দিয়ে। একপাশে গভীর খাদ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে খাঁজকাটা পথ। নীচের উপত্যকা দিয়ে সরস্বতীর রুপা ঢালা জলস্রোত দেখা যাচ্ছে। তারই তীর ধরে আমাদের চলার পথ। নদীর ওপারে দূরের ঘন সবুজ পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে রুপালী ঝরনা নামছে, কোথাও জলপ্রপাত হয়ে পড়ছে। এপার থেকে মুগ্ধ নেত্রে সে দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি!

আকাশ মাঝে মাঝে মেঘলা, মাঝে মাঝে পরিষ্কার। কখনো কখোনো ঝির্ ঝির্ করে শীতল হাওয়া বইছে। তার স্পর্শে সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যায়!

আরও এগিয়ে দেখছি, ওপারে পাহাড়ের গায়ে নীচের দিকে নদীর তীর ঘেঁসে চাযের ক্ষেত, ধাপে ধাপে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। কোনটি সবুজ, কোনটি সোনালী। পাহাড়ীরা ওখানে কি বুনেছে কে জানে?

পথের উপর বড় একটা ঝরনা জমে বরফ হয়ে আছে। গ্রীষ্মের সমাগমে তুষার গলা শুরু হয়েছে এখনো শেষ হয়নি। তারই উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি।

সরল পথে দাদা অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। মেজর তাঁর সঙ্গ নিয়েছেন। আমার পায়ের যন্ত্রণা একই রকম আছে, তাই অনুকম্পাভরে উনি আমার সাথে সাথে আছেন। তাছাড়া তল্পীদার দিলীপ তো আছেই। আমি থামলে ওরা থামছে, চললে চলছে। মাঝে মাঝে ঝরনার সুমিষ্ট জলে তৃষ্ণা নিবারণ করছি। ঘাসতৌলীর পথে আসা দু' চার জন লোকের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। তারা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। এপথে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই হয়। দুই একজন প্রশ্নও করে ফেলছে। আর আমাদের চলার পথের খবর শুনে আশ্চর্য্য হয়ে "ধন্য ধন্য" করছে বারবার।

পথের বাঁকে বাঁকে মাঝে মাঝে মেজর সাহেবকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যখনই দেখছি, তখনই বিশ্রামের জন্য থামছি। তাই মেজরকে আর ধরা যাচ্ছে না। তবে দুপুর বারোটা নাগাদ দিলীপ দেখাচ্ছে, ওই দেখুন, আবার দেখা যাচ্ছে। মেজর সাব চলেছেন। সত্যেনবাবু সরস্বতীর উপর Natural bridge পার হচ্ছেন। ওখানে থেমে ঘুরে ফিরে ভালো করে ব্রীজ-এর প্রস্তর শৈলী নিরীক্ষণ করছেন। কিন্তু আশেপাশে কোথাও দাদার চিহ্ন মাত্র নেই। তিনি এগিয়ে গেছেন। এতক্ষণে হয়তো মানাগ্রামে পৌছে গেছেন! সাধারণ পাহাড়ী পথে দাদা চলেন পাহাড়ীদের মত। মেজর সাহেব তাই তাঁর সাথে তাল রাখতে পারেননি।

আধঘণ্টার মধ্যে আমরাও সরস্বতীর উপর Rock-bridge-এ পৌছলাম। এখানে সরস্বতী নদী খুব কাছাকাছি প্রায় গায়ে লাগো লাগো দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকের মাঝখান দিয়ে প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে পড়ছে। প্রকাণ্ড বড় একটি পাথর স্বাভাবিক ভাবে পাহাড় দুটির সেই ফাঁকের মধ্যে গড়িয়ে এসে আটকে আছে। যদিও সাবধানতার জন্য তার উপরেই ছোট একটা কাঠের পোল তৈরী করা আছে।

সরস্বতীর কি ভয়ঙ্কর রূপ এ জায়গায়! প্রবল বেগে অন্ততঃ আড়াইশো ফুট নীচে পড়ছে পাহাড়ের উপর থেকে। আর নীচে পড়তে পড়তেই জলকণা ধোঁয়া হয়ে উড়ে উড়ে চলেছে। গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথীও এমনি করে গৌরীকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তবে সে এত নীচে নয়। তার শেষ দেখা যায় —সাবধানে মাটিতে শুয়ে নীচের দিকে তাকালে। একমাত্র অন্ধকার অন্তরায়, অর্থাৎ সূর্য্য যদি মাথার উপর না থাকে। কিন্তু সরস্বতীর শেষ নৃত্য দেখা যায় না, নীচু, অন্ধকার এবং বিশেষ করে বাষ্পের জন্য।

দূর থেকে দেখি, পাহাড়ের গায়ে আর তিল ধারণের স্থান নেই। নদীর তীর থেকে উঁচু পর্যন্ত সারি সারি ক্ষেত সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে। সহজেই বুঝতে পারি এবার মানা গ্রামে (১০,২৯০ ফুট) পৌছাতে আর আমাদের দেরী নেই। লোকালয় এগিয়ে এসেছে! সারাদিন অভুক্ত, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলেছি। এখানে নিশ্চয় খাবার জুটবে! অচল পাদুটিকে জোরে চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

বেলা দুটোর সময় মানাগ্রামে পৌছে গেলাম। এখানে Check-post-এ

খবর দিতে হল। কিন্তু কর্তা দিবানিদ্রায় ব্যস্ত। লোক মারফৎ জানিয়ে দিলেন, "সব ঠিক হ্যায়, যানে দেও।" ঘাসতৌলীর P.A.C. Camp থেকে wireless-এ আমাদের আগমনের খবর এখানে আগেই পৌঁছে গেছে! তাছাড়া স্বামীজী ও দাদা আগে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়েও গেছেন। পরে এসব কথা জানলাম।

আমরাও কালক্ষেপ করিনা। এগিয়ে চলি। ডাইনে অলকানন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গম "কেশব-প্রয়াগ" দেখা গেল। কথিত আছে মানার নিকট ব্যাস গুম্ফাতে ব্যাসদেব মহাভারত লেখেন। দূরে খুব উঁচু একটি পাহাড়ের মাঝ থেকে একটা ঝরনা লাফিয়ে নামছে। উপরের দিকে একটু অংশ রৌদ্রালোকে রুপার স্রোতের মত দেখা গেল। পরে জানলাম, ওইটিই বিখ্যাত "বসুধারা" জলপ্রপাত। এটি চারশো ফুট উঁচু থেকে পড়ছে। প্রতিবৎসর বদ্রীনারায়ণ থেকে বহু যাত্রী এখানে আসে সৌন্দর্য্যময় প্রপাতটি দেখতে।

মানাগ্রামের মাঝপথে একটা ঝোলান পুল দিয়ে অলকানন্দা পার হয়ে আমরা নারায়ণ পর্বতে পৌঁছালাম। চারিদিকে ঘরবাড়ি, মাঝে মাঝে ফসলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখি একটা চায়ের দোকান। অনেকক্ষণ থেকেই খাবার দোকানের খোঁজ করছি। খাবারের লোভে ভিতরে ঢুকে দেখি, মেজরসাব্ আর আমাদেরই জনা কয়েক কুলি বসে চা, পকোড়া ও আপেল খাচ্ছেন। আমরা পৌঁছতেই ওরা আনন্দে কলরব করে উঠলেন। আমরাও তাদের সাথে ক্ষুধা নিবৃত্তির শুভকাজে যোগদান করলাম। কিন্তু আমাদের পূর্বগামীদের কৃপায় এবং এত বেলায়, প্রায় ২॥টা বাজে তখন, খাদ্য অল্পই জুটলো। নির্বিকার চিত্তে, পরম তৃপ্তিতে টক আপেল ও শুকনো ঠাণ্ডা পকোড়া খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি হল।

বদ্রীনারায়ণ আর দূরে নেই। অলকানন্দার কলগুঞ্জন কানে আসছে। দেহ সুস্থ বোধ করতেই আবার চলা শুরু করেছি। দুই পাশে ফসলভরা ক্ষেত তার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ী গ্রাম্য পথ, প্রায় সমতল। মাঝে মাঝে ছোট কুটির। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আঙ্গিনাতে বসে খেলা করছে। বাড়ির গৃহিণীরা সংসারের কাজের পাট চুকিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে রৌদ্রে বসে বিশ্রামের ফাঁকে গল্পের আসর জমিয়েছেন। সকলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—উল্টোপথে যাত্রী কোথা থেকে আসে!

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই বদ্রীনারায়ণ মন্দিরের চূড়া তার চারিদিক ঘিরে শহরের দোকান পাট, ঘরবাড়ি সব দেখা গেল। আমরা তো তবে পৌঁছেই গিয়েছি। ওই তো পূর্ব পরিচিত স্থানগুলি, দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! ওই তো নদীর বাঁধানো ঘাট, বদরী বিশালের পদতল ধৌত করে পুণ্যতোয়া অলকানন্দা বয়ে চলেছেন। ওই তো ব্রহ্ম কপালের বাঁধানো চত্বর। বাঃ বেশ সুন্দর ঘাটটি হয়েছে তো? ওই তো বরাহশিলা! ওর পাশেই তপ্তকুণ্ড। আমাদের ব্যথাজর্জ্জরিত ক্লান্ত দেহ তপ্তকুণ্ডের উষ্ণজলে অবগাহন করে তৃপ্তিলাভ করবে!

মন সতেজ হয়ে উঠেছে। আর দেরী সইছে না। বদ্রীনাথের সাদর আহ্বান যেন শুনতে পাচ্ছি। এসেছ! তোমরা এতদিন পরে এসেছো! এখানে কতদিন ধরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি যে! তোমরা শ্রান্তিভরা দেহ নিয়ে এসেছ, অতি কঠিন দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমারই দুয়ারে এসেছ। সব আরাম, সব স্বাচ্ছন্দ্য তোমাদের জন্য সাজিয়ে নিয়ে তাই প্রতীক্ষা করে আছি।

চোখে জল ভরে আসে, আনন্দে! কৃতজ্ঞতায় যেন পা দুটি জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। আর তো তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজন নেই। একপা একপা করে ধীর শান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকি। সাথে সাথে মনে মনে শত সহস্র প্রণাম নিবেদন করি বদ্রীনারায়ণের পদতলে!

*    *    *    *

আমাদের দুর্গমপথে যাত্রা শেষ হলো কিন্তু পথ চলার শেষ হল না। বহুরূপী হিমালয়ের যে রূপের অবধি নেই, তাই আছে তার পথে পথে চলার দুর্নিবার আকর্ষণ। সেই জন্যই আজ পথের অপার দুঃখ কষ্ট মনে পড়েনা, মনে পড়েনা অনন্ত অসুবিধার কথা, কি ভাবে অশিক্ষিত পদক্ষেপ করে চলেছিলাম দুর্গম রাজ্যের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্করতার মধ্যে। কেবল মনে পড়ে কি দেখেছিলাম, কি অপরূপ শান্ত সৌম্য রূপের অনন্য সমাবেশ! এ রূপের শেষ নেই। দেখে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। —তীব্রতর আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে হিমালয়ের নবতর রূপ দেখবার জন্যে। তাই আবার তৈরী হয়ে রওনা হই বৎসরান্তে—আবার চলা শুরু করি নূতন পথে হিমালয়ের নতুন রূপের সন্ধানে!

—o—